KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : নিখিলেন্দ্র চক্রবর্তী
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 24 25 26 27/1	Year of Publication : শারদ সংখ্যা ১৩৮৩ Apr - Sep 1977 Apr - Sep 1978 Apr - Jun 1979 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : নিখিলেন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা কেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

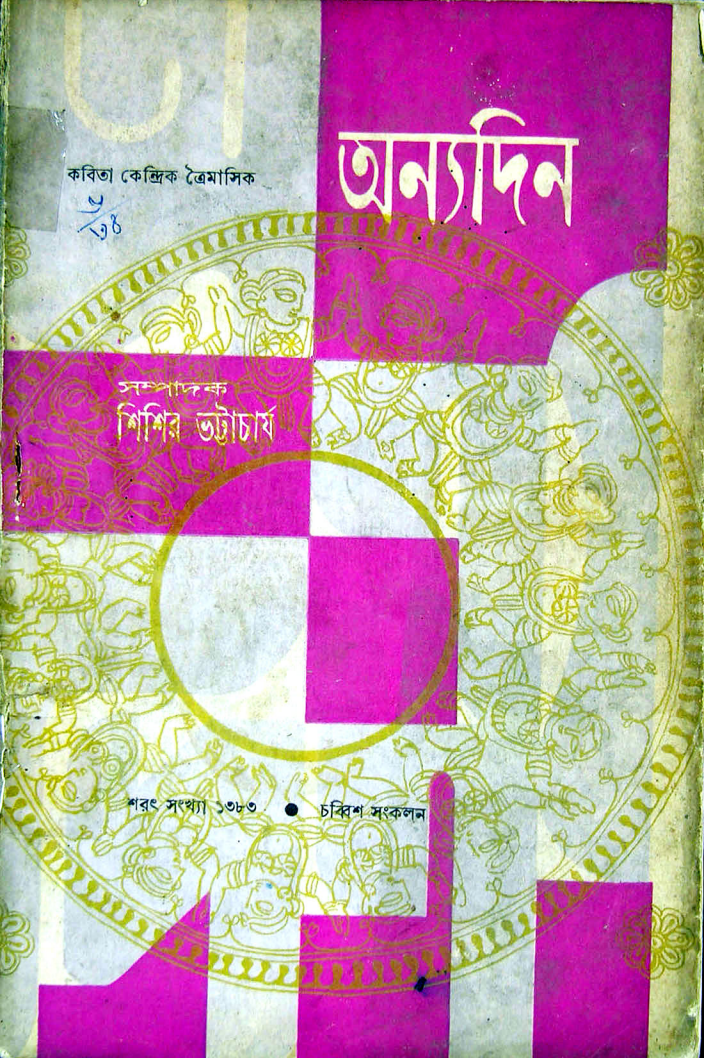

শরৎ সংখ্যা ১৩৮৩ ● চব্বিশ সংকলন

আকাশে শরৎ। মানুষের মন এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটতে চায় দূর দিগন্তে যেদিকে নদী, সমুদ্র, পর্বত, যেদিকে সৌন্দর্য এবং সুষমা। আমরা জানি। এবং আমরা প্রস্তুতও। মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে আমরা বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের, সৌজন্যের, সহ-যোগিতার। বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই। তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের চলা-হাঁটার পথে শৃঙ্খলাও এক সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

দেশের কল্যাণে

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

আজই যে-কোন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা
কেন্দ্রে গিয়ে ছোট পরিবার সম্পর্কে
খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থা হইতে প্রচারিত।

TAPAS BHARAI
67/5, Seven Tanks Estate
COSSIPORE CLUB
CALCUTTA-700002

নজরুলের

অমর

আত্মার

শান্তি

কামনায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা

আশা

নজরুল ইসলাম

আমি   শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে ট'লে,
আমার   লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধরবে কি ঐ কোলে ?
বাড়িয়ে বাহু আসবে ছুটে ?
ধরবে চেপে পরাণ-পুটে ?
বুকে রেখে চুমবে কি মুখ
নয়ন জলে গ'লে ?
আমি   শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে ট'লে !
তুমি   এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা
তা   ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা ?
বল বল জীবন-স্বামী,
সেদিনও কি ফিরব আমি ?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না
ঐ চরণের তলে ?
আমি   শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে ট'লে !

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

*

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

*

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

*

দাম ঃ আড়াই টাকা

শরৎ সংখ্যা ১৩৮৩
চব্বিশ সংকলন

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রবন্ধ

পংকজ সিংহ

গল্প

অশোককুমার সেনগুপ্ত
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সুব্রত নিয়োগী
শিশির ভট্টাচার্য
জীবন সরকার

কবিতা

অখিল দত্ত * অনীশ ঘোষ * অপরাজিতা গোপ্পী * অভিজিৎ ঘোষ * অমিয় সরস্বতী * অম্বরায় সরস্বতী * আশিস শিবনাথ * উজ্জ্বল সিংহ * কমল চট্টোপাধ্যায় * কমল তরফদার * কবিরুল ইসলাম * কুমারেশ চক্রবর্তী * কৃষ্ণ ধর * কৃষ্ণসাধন নন্দী * গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * তপন বন্দ্যোপাধ্যায় * তাপস ওঝা * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দীপক কর * নচিকেতা ভরদ্বাজ * নির্মল বসাক * পিনাকী ঠাকুর * পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত * প্রদীপ রায়চৌধুরী * প্রণব মাইতি * প্রফুল্ল মিশ্র * বিনোদ বেরা * বিপ্লব চন্দ * বেণু সরকার * ব্রততী বিশ্বাস * মহেন্দ্রপ্রসাদ সাহা * মিঠু মুখোপাধ্যায় * মুকুল গুহ * মেজবাহ খান * মোহন মিত্র * মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় * রতন বিশ্বাস * রণজিৎ দেব * রঞ্জন বিশ্বাস * রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় * রুচিরা শ্যাম *

শিশির গুহ * সুশীল রায় * শংকর মিত্র * সন্তোষকুমার অধিকারী * সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় * সমরেন্দ্র দাস * সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত * সমীর চট্টোপাধ্যায় * সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় * সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় * স্বপন মজুমদার

ছোট বিদেশী কবিতা

আলবানিয়া

মিগজেনি

অনুবাদ : শিশির ভট্টাচার্য

আমেরিকা

স্টিফেন ক্রেন

অনুবাদ : রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

সিন্ধী

শেখ অয়াজ

অনুবাদ : শ্যামল মুখোপাধ্যায়

আলোচনা

সন্তোষকুমার অধিকারী

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি

মুরশিদাবাদ

কবিতার খবর

চোতের গান ঘেঁটু গান

পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দেবদেবীকে সামনে রেখে যে-সব গানের সূত্রপাত 'ঘেঁটু গান' তাদেরই একটি। যেমন ভাদু গান, তুসু গান, এক্ষেত্রে ঘেঁটুর সঙ্গে গান শব্দ যোগ দিয়ে ঘেঁটু গান।

হিন্দু কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাদু বা তুসু গান যেমন প্রভাব বিস্তার করে আছে ঘেঁটু গান কিন্তু এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই বলে এটা কখনই নয় লোক-সংস্কৃতির গুরুত্বের দিক দিয়ে এ গান উপরোক্ত গান দুটির থেকে কোন অংশে কম।

ঘেঁটু দেবী নয়, দেবতা, প্রচলিত ঘেঁটু গানের শব্দ থেকেই এটা সহজে লক্ষ্য করা যায়।

ঘেঁটু গুড় গুড়
কেঁদো না কেঁদো না ঘেঁটু
বিয়ে দেবো দূরে।

অথবা

আয়রে ঘেঁটু নড়ে
হাতীর পিঠে চড়ে।

ইত্যাদি, 'আয়রে' এবং সরাসরি হাতীর পিঠে চড়ে আসতে আমন্ত্রণ সহজিয়া ভাষায় পুরুষকেই করা যায়।

চৈত্রের সন্ধ্যাই হলো এই ঘেঁটু গানের উপযুক্ত সময়। ক্রমশঃ এই একই নিয়ম চলে আসছে, অন্য কোনও মাসে ঘেঁটু গান হয় না। সেইজন্য গ্রামের প্রবীণ ক্ষেত-মজুরদের মুখে চৈত্র মাস আখ্যা পায় "ঘেঁটু মাস" নামে। আপাতদৃষ্টিতে ফসল সংক্রান্ত যে-সব কাজ সেগুলো সব ফাল্গুনেই শেষ হয়ে যায়। কৃষক এবং ক্ষেত-মজুরদের কাছে চৈত্র এমনিই একটি মাস যে মাসে কৃষিকাজের কোনও গুরুত্ব থাকে না বলেই হাতে থাকে অনেক বেশী সময়।

আর সে কারণেই এই গানের চর্চার উপযুক্ত সময় হিসাবে চৈত্র মাসকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

ঘেঁটু গানের চর্চা সবসময় ক্ষেতমজুর শ্রেণীর লোকরাই করে থাকে।

চৈত্রের শুরুতেই এই গানের আখড়া বা মহড়া শুরু হয় ক্ষেত-মজুরদের বারোয়ারী মনসাতলা, কালীতলা অথবা মূল গায়েনের ঘরে। এই গানে ক্ষেত-মজুরদের যুব-সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়, মূল গায়েন অর্থাৎ প্রধান গায়কের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন তালিম নেওয়ার পর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের ঘরে ঘরে। জনসংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী একই গ্রামে একাধিক দলেরও সৃষ্টি হয়! কোনও বাদ্যযন্ত্র এই গানে ব্যবহার করা যায় না, আস্ত খড়ের আঁটিকে মেয়ের চুলের লম্বা বেণীর মত করে বাঁধা হয়, এগুলি 'মোশ' নামে পরিচিত। ঘেঁটু গানের দলের প্রত্যেকের হাতে তেমনি একটি করে 'মোশ' থাকে।

দলে থাকে একটিমাত্র মূল গায়েন, বাকী যারা তারা সব 'দুয়ারী' অর্থাৎ জোগানদার। গান গাওয়ার সময় মূল গায়েনের গানের লাইন ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়, কিন্তু দুয়ারীদের জোগান দেবার জন্য গানের একটি নির্দিষ্ট লাইন থাকে। দুয়ারীরা কোনও সময়েই এই লাইনটি অতিক্রম করে যেতে পারে না। গানের লাইনটি হলো—

ও হরি ও রাম

অথবা

ভাই বলেছে রাম রাম।

বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে চৈত্রের সন্ধ্যামুখর করা দু চারটি গানের মধ্যে বহু প্রচলিত ঘেঁটু গানটি হলো—

আয়রে ঘেঁটু নড়ে
হাতীর পিঠে চড়ে
হাতী গুড় গুড় বাজনা বাজে
তা শুনতে পলুই নাচে
আয়রে পলুই জুয়ো খেলাই
জুয়োটুয়ো খেললাম
হাল লাঙ্গল করলাম

হাল লাঙ্গল কন্দুর যায়
দলবল ভেঙ্গে যায়
দল বনের চুমচুমিটি
ভাঙ্গব বনের ঘুমঘুমিটি
বুড়ী আনল চোত্ মাস
চোত্ মাসেতে চতুর্দশী
বুড়ীর কপালে চন্দনঘোসী
ঘসতে ঘসতে পড়ল ফোঁটা
ও বুড়ী তোর সাত বেটা
সাত বেটা তোর সাতুন্তে
এক বেটা তোর মাগুন্তে
মাগুন্তে ভাইরে
কড়ি গুণতে যাইরে
কড়ির আড়ে কড়া ছোটে
রাজার ঘরে নাই ওঠে
কিসের নাই কিসের দাই
খাড়াই কাটিয়ে বাঁশ
বাঁশ লিখল জোড়ের জোড়
পয়রা লিখল বত্রিশ জোড়
আয় পয়রা ডাক দিয়ে
ধোবা ঘাটে জল খেয়ে
মোশ পড়ল দড়াম দিয়ে।

গানের শেষ লাইনটি সকলে একসঙ্গে বলে মোশগুলিকে স্বজোরে উঠানে পিটতে থাকে। শব্দ ও ধুলোতে উঠান পরিপূর্ণ হয়, গৃহস্থের মেয়েরা সেই মোশদের শান্ত করে জল দিয়ে। মাটিতে ঢালা এই জল নাকি পুণ্যের। সেইজন্য পতিত জল নিয়ে ছেলেমেয়েদের মাথায় দেওয়া হয়, নিজেরাও নেয়। তারপর গৃহস্থের সাধ্য অনুযায়ী চাল, কলাই, আলু ইত্যাদি রান্নার সামগ্রী এই গানের দলকে দেওয়া হয়। ঘেঁটু গানের দল গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, নিকটবর্তী গ্রামেও যায় এবং গান শুনিয়ে আদায়ী জিনিসপত্র নিয়ে আসে।

দিনের পর দিন গিয়ে চৈত্রের সংক্রান্তি আসে, চৈত্রের শেষ রাতে হয় ঘেঁটু গানের রাত জাগরণ। আদায়ী জিনিসপত্র ক্ষেত-মজুরদের কোনও বারোয়ারী জায়গায় রান্না করে দলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে খায়। শুধু তাই নয় আগে থেকে মদের ব্যবস্থাও থাকে। নিজেরা মাতাল হয়, নাচে গানে সারারাত মাতাল করে রাখে নিজেদের পাড়াকে, গ্রামকে।

ঘেঁটুর কোনও বাঁধাধরা গান নেই, এ গান মুখে মুখে বাঁধা হয়, ক্ষেত-মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা একটু সখালো তারা নিজেরাই এই গান রচনা করত। কতকগুলো শব্দকে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই চলত তাতে তার কোনও অর্থ থাক বা না থাক। উপরের বহু প্রচলিত অর্থ-হীন গানটি তারই একটি সাক্ষী।

বর্ধমানের অর্থনীতিতে যেরো চাষের গুরুত্ব অনেক বেশী, সে কারণে এই চৈত্রের যেটুকু ফাঁকা সময় ছিল তাও কৃষিকার্যের আওতায় এসে গেছে। এর অর্থই হলো ক্ষেত-মজুরদের অনেক বেশি কাজ। কাজের শেষে ক্লান্ত মনে এ সবের স্থান দিতে পারে না। আবার অন্যদিকে এই ঘেঁটু গানে মাততে গিয়ে নিজেদের রুজি-রোজগারে বাধা আসুক এটাও কেউ চায় না, লক্ষ্য করার বিষয় হাতে পয়সা আসার ফলে আনন্দ গ্রহণের রুচিও পাল্টে যাচ্ছে। এখন ক্ষেত-মজুর ঘরের যুবরা অনেক বেশী সময় খরচ করে সিনেমার লাইনে অথবা চ্যারিটি শোয়ের যাত্রার পিছনে।

সাধারণভাবেই এই ঘেঁটু গানের মতো একটি লোকসংস্কৃতির রেওয়াজ ও প্রভাব দিনের পর দিন কমতে শুরু করেছে। এখনও যেটুকু আছে সেটুকু ধরে রেখেছে ক্ষেত-মজুরদের বাচ্চা ছেলেরা, এটাও কিন্তু বেশীদিন নয়। বিনা সহযোগিতায় এর ক্ষীণ উদ্দীপনা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না, আগামী দিনে কলমের ভাষার খাতিরে শুধু বলতে হবে—

এক যে ছিল গান
চোতের গান ঘেঁটু গান

অশোককুমার সেনগুপ্ত

সোনার বাপ

—বাবু বুন কার বটেক ?

চুপ করে থাকি। বুন অর্থাৎ বনজঙ্গল। এগুলোর মালিকানা জানতেই প্রশ্ন। অর্থ অনুধাবন করতে দেরী হয় না। তবু কিনা প্রশ্নটায় আমার অজানা কোন গভীরতর উদ্দেশের রৌদ্রঝলক শাণিত কোন অস্ত্রের দ্যুতি আছে, আমি টের পাই।

—চুপ বারে কেনে ? তু বল বাবু বুন কার বটে ? ই মাটি কার ? কার লেগে আকাশ থেকে জল পড়ছেন ? কার জল ?

চমকে উঠি। এই পটভূমিকায় শব্দগুলো বড় অবিশ্বাস্য। খাঁকি ছেঁড়া হাফসার্ট, কোমরে নেংটি সম্বল ন্যুব্জ বয়সী প্রায় বৃদ্ধ মানুষটি, তা দারিদ্র্য হোক অথবা জরাই, বলিরেখা অঙ্কিত তামাটে মুখ আমার সামনে জ্বল জ্বল করে। শূন্য ঘরখানার বর্ণনায় আমার শব্দের ভাঁড়ারে কেবল খাঁ খাঁ, যথেষ্টই মনে হয়। কাকতাড়ুয়ার ছিন্ন মুণ্ডের মত একধারে পড়ে আছে মাটির কালিপড়া হাঁড়ি। শূন্য দেওয়াল, জানালার কথা মনেই হয় না। কুঁড়ে ঘর, নিচু চাল। বৃষ্টির বিগলিত ধারা একপাশে স্রোতস্বিনীর জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু চমকিত হবার কি আছে ! আউল বাউলের দেশ আমার। গভীরতম তত্ত্বকথা ধুলোয় বালিতে গড়াগড়ি যায়। ঘুঘুর ডিম মানুষটার চপেটাঘাত কি বাবুয়ানি শহুরে কেতাদুরস্ত আমাকে অবাক করার মত কিছু। ধুতি পাঞ্জাবী কাঁধে শান্তিনিকেতনী গৈরিক ব্যাগ, হাতে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিল ব্যান্ড ঘড়ি, পায়ে চটি বাবু মানুষটির আঁতে ঘা এর আগে বহুবার লেগেছে। সেই যে ভিখারী মানুষটা, নাম জানি না, বোল হরিবোল বলে দরজায় দাঁড়াত, একদিন কি চাবুক কষাণর মতই বলেনি, মহাবিরিক্ষি দূরে থামেন বাবু,

কিন্তুক ভিতরে ভিতরে হেক দুর শিকড় চালান। এমন গভীর কথা বলতে পারে একজন ভিখারী। আমি নিজের কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। এই মানুষটির কথায় চমক তবু থেকে যায় কেন? কিন্তু উত্তরটা গভীরই হয়। স্পষ্ট গলায় বলি,—মানুষ। সব মানুষের জন্যে।

লোকটা মোটেই চমকায় না। প্রফুল্লতা কি কালো ওষ্ঠাধারে মুহূর্তের জন্যে ঝলকায়, টের পাই না। বলে ওঠে—ঠিক কথা বলেছিস্ বাবু। বিবাক মানুষের লেগে। তা আমিও ত মানুষ বটে! কিন্তু বুঝে না কেনে?

কার উদ্দেশে অভিযোগ প্রশ্ন করি না। গভীর বেদনা আমাদের দার্শনিক করে। কিন্তু এখন বিষয়টি আমাকে কোন কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। আলিগড় শিশিল প্ল্যাণ্টেশান দেখতে গিয়েছিলাম। শিশিল আনারসের মত পাতার এক জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা থেকে দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। বিশাল অচাষযোগ্য ভুঁইয়ে চাষ হচ্ছে। ফেরার পথে টুকরো বনভূমি পার হতে না হতেই আকাশ কালো। তারপর বৃষ্টিপাত। মাথা বাঁচাতে এই এই ঘরে ঢুকে পড়েছি। তারপরই এই প্রশ্নের মুখোমুখি। এদিকে হাতের ঘড়িতে বেলা বার। প্রায় ছ' কিলোমিটার নির্জন পথের ক্লান্তি অবসন্নতাও আঁকড়ে ধরেছে পা। ওদিকে বৃষ্টি তাড়নায় প্রকৃতি প্রমত্ত। সবুজ বনভূমি ধবধবে সাদা বৃষ্টির চাদরে মোড়া। আকাশে মেঘঘর্ষণের শব্দ নেই। কিন্তু বারিপাতের প্রচণ্ডতা একটানা বাজনা বাজাচ্ছে। মানুষটা বৃষ্টির জন্যে সঙ্গী পেয়েছে, দুঃখের কথা বলবেই। আপ্যায়ন করেনি। ঢোকার কয়েক মুহূর্ত পরেই সরাসরি এই প্রশ্নবাণ।

—তু শুধুলি না কে বুঝে না? আমার নীরবতাতে প্রশ্ন করে ওঠে ঝাঁকালো স্বরে। বলতেই হয়—কে?

—মানুষ! মানুষ বুঝে না।

মানুষই মানুষের শত্রু। জীবন বড় জটিল! ভাষার জটিলতাও বড় ভয়ঙ্কর! আবার ঘোর প্যাঁচ! চোখ তুলে দেখি জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তার ক্রোধ।

লুকে বলে বুন সুরজিবাবুরে।

সুরজিবাবু কে?

বিটবাবু? তু কুথাকার বটিস? কুছু জানিস্ না। বুনের বিটুবাবু।

আমাকে বলেছে, বুনে ঢুকবি না। তুকে চালান করে দুব থানাতে, সিখান থেকে জেহেল। বুনে, বুন কার বটে? আঁ তু বললেই তুর। ঠিক বটেক। আমি ডুমোর পাড়ি, ছাতু তুলি পাত লিয়ে বিচি, কিন্তুক তোমরাও ত বটেক। কাঠ লিয়ে বিচি। তা দিবেক না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা নাচায় মানুষটা, তা আমি ছাড়ব কেনে? জামগাছ পুঁতেছি আমি, ডুমোর গাছ লাগিন ছি।

সমস্যাটা ঝটিতি মাথাতে চলে আসে। এ অঞ্চলের ভাঙচুর বনভূমিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বনজ সম্পদের উন্নয়নের ব্যাপারে। নতুন নতুন চারা লাগান হচ্ছে। বিটবাবু গার্ড নিয়োজিত হয়েছে। রুক্ষ শুষ্ক ভুঁইয়ে ইতিমধ্যে চমৎকার শ্যামলিমা। এই মানুষটির উপার্জন বনেই ছিল, এখন বাধা হয়েছে। তাই এই প্রশ্ন। বাবুচেহারার আমাকে কথাটা বলে সে বোধকরি কোন স্বরাহা চায়। অথবা বিটবাবু আমি সমগোত্রের এমন ধারণাতেই এ প্রসঙ্গ মাথাতে এসেছে। অসম্ভব কিছু নয়। এই শ্রেণীবিন্যাস ওরা উগ্রভাবেই মানে। যেমন কিনা এক অপরাধীবাবুর জন্যে অন্য নিরাপদরাধী বাবুটিও বিপাকে পড়ে। এমন দৃষ্টান্ত আছে।

—কি নাম তোমার?

—লুকে বলে সুনার বাপ। তু বিটবাবুকে বলবি?

—বিটবাবুকে আমি চিনি না। বাইরে তাকাই। বৃষ্টিভেজা বনানী ক্ষেত এখনও অস্পষ্ট, তবু মনে হয় থেমে আসছে। গলা বাড়াই। এবার হাঁটা যেতে পারে। আকাশে মেঘের দল ঘুরছে। যে-কোন সময় তারা মাথার উপর ইয়ার্কি সুরু করে দেবে। অথবা এটা তো বর্ষারই রেওয়াজ। সোনার বাপকে বলি বলার প্রয়োজনও বোধ করি না। হাঁটা সুরু করি।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে চটিসমেত পা মাটিতে গেঁথে গেঁথে যায়। স্নাত প্রকৃতি বড় কমনীয়। মাথার উপর হাওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত বৃষ্টির মেঘ ছোটাছুটি করছে। খাড়া পশ্চিমে একটা কালো চাপড়া মাথা তুলছে। এদিকে না এলেই হয়। হাঁটার অসুবিধা সোনার বাপের কথা মনে করতে দেয় না। দিলেও আমার পরিধি আমি তো জানি। মানুষটাকে ভুলে যেতে বাড়ীর এই রাস্তাটুকু হাঁটাই যথেষ্ট।

ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ী থেকে আবার কর্মক্ষেত্র, শহুরে জীবন, চার-চাকার ঘড়ঘড়ানি, অফিসের গুঞ্জন। গ্রামের বাড়ীতে মাসখানেক পর গিয়ে

অঞ্চল অফিসের জোড়া চেয়ারে বসে আছি। টেবিলের ওধারে অঞ্চল-সচিব শিবনাথ। গ্রাম-বিষয়ক আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় বাইরে দাওয়ায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে স্যান্ট সার্টে দীর্ঘ কালো একটি মানুষ এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটে সিগারেট। ভেতরে ঢুকতেই আপ্যায়ন জানালেন শিবনাথ। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিই সূর্যকান্তবাবু, বিটবাবু এই বনাঞ্চলের। ঝটতি সোনার বাপের মুখখানা ছলকে উঠল। কিন্তু বড়ই অপ্রাসঙ্গিক মনে হল কথাটা তোলায়। বিটবাবু তাঁদের ফরেস্ট অফিসে যাচ্ছেন। অঞ্চল অফিসে এসেছেন নিছকই দেখা করার জন্যে। কিন্তু বনের কথা উঠল। বিটবাবু বললেন, একটা নোটিশ দিন শিবনাথবাবু, শালকাঠ চুরি হচ্ছে, কিন্তু চোর ধরা না পড়লে যাদের বাড়ীতে শালকাঠ পাওয়া যাবে তাদের আমি ছাড়ব না। না কিনলেই কেউ চুরি করবে না। আসলে দোষ তো আমাদের। গ্রামের সবারই হেল্‌প চাই, আর তারা যদি চোরকে উৎসাহ দেন, এ বন উবে যেতে ক'দিন!

—চুরি যাচ্ছে শালগাছ? কিন্তু আমাদের গ্রামে তো বেচতে আসে না।

—আপনি খবর রাখেন না শিবনাথবাবু! আজই খোঁজ নিন না, দেখবেন ঢের ঘরে কাঠ বেরুবে।

হাসির মধ্যে শিবনাথবাবু বললেন,—ভাল কথা। সোনার বাপের খবর কি?

—কোন আত্মীয়ের বাড়ী যেন গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। আমার গার্ডকে বলেছে, দেখে নেব। পাগল। একটা পাগল। বনের মধ্যে অনেক গাছ নাকি লাগিয়েছে, সেগুলো ওর ফেরত চাই। সূর্যকান্তবাবু হাসলেন না। থমথম করছে মুখ। বললেন,—কিন্তু হাসির কথা নয় মশাই, এ ব্যাপারে একটা ড্রাস্টিক অ্যাকশন আমাকে নিতে হবে। গাছ উপড়ে ক্ষতি করতে পারে। ওকে কোন বিশ্বাস নেই।

এতক্ষণে কথা বললাম,—সোনার বাপ আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, এ বন কার?

বিটবাবু অসহিষ্ণু গলায় বললেন,—রাখুন মশাই ওর বড় বড় কথা। আমাকেও চমকানর মত কথা বলেছে। একদিন বলল, তুর রক্ত লাল আমার রক্ত লাল। দুই সমান। তু মানুষ আমি মানুষ। তুর বন হলে আমারও বন। আসলে লোকটা মহা চালু। আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বনের ক্ষতি করে জেলে গেলে, আমার লাভ কি, বন তো নষ্ট হল।

অঞ্চল অফিসে কথা শুনে সোনার বাপ সম্পর্কে জানার একটা আগ্রহ আমার মনে জন্ম নিয়েছিল। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি এ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যক্তি সে। সকলেরই চেনা। চাষ করত আগে পরের জমি। এক মেয়ে দুমকার ওধারে বিয়ে হয়েছে। পয়সার চেয়ে চালমুড়ি বিনিময়েই সে ডুমুর টুমুর দেয়, পাতা বেচে। দাম দারুন চড়া। আর একদর। বড় বড় কথা বলতে ওস্তাদও বটে। কারও কারও মতে সামান্য ছিটগ্রস্ত। ভাল চাষী ছিল একদিন। জমি সংগ্রহও করা এখনও কঠিন নয়, কিন্তু কি যে মানুষ পাগলের মত ঘুরতেই অভ্যস্ত। পেটের টান না পড়লে দেখা যায় না। তখুন ডুমুর কি মহুয়ার ফল কোঁচড়া, পাতা আনতে বললে, বলে,—ঘরে চাল আছে আমার! ভাত রাঁধতে হবেক, তুর লেগে ডুমোর আনবার অবসর কোথা। যেন বিনামূল্যে ডুমুর দেয় এমন ভঙ্গী।

শুনে টুনে কৌতুক বোধ করেছিলাম। ওটুকুই যথেষ্ট। মানুষের জীবনের পৃথিবীর রহস্যের একটা সপ্রাণ অংশমাত্রের একটা অদ্ভুত কণিকা। পর্যবেক্ষণের সময় কোথা কর্মমাটি। কিংবা সেই যন্ত্র, যাতে কিনা উপাদান গুলোর সেলি বিভিন্নতা নিয়ে তন্ময় থাকা যায় কিছুক্ষণ।

মাসকতক পরে বন কিন্তু আমাকেও পীড়া দিল। আগের দিন গাঁয়ে গিয়েছি। সকালেই শুনি আমাদের গাইজোড়া বনে ঢুকেছিল বলে আটকে রেখেছে গার্ড। খোঁয়াড়ে দেবে। রাখাল বালকটি কাঁদ কাঁদ মুখে এসে বলল, আমি গেলেই নাকি ছেড়ে দেবে। মাও ঠেলে পাঠালেন। যেতে হল। মাথার উপর তপ্ত রোদ। বাতাসেও আগুনের হালকা। আধকিলোমিটারের পথ। রুক্ষ শুষ্ক ভুঁইয়ে চমৎকার শ্যামলিমা এখন মনে হল না। স্বার্থে ঘা পড়েছে। কিন্তু ছাড়বে তো গরু। তবে বিটবাবু আছেন।

গরু জোড়াকে সামনে রেখে খাকি প্যান্ট সার্ট পরা গার্ড বসে আছে। পাশে লম্বা লাঠি হাতে ও কে? সোনার বাপ মনে হচ্ছে! আমি যেতেই গার্ড রোগা ভদ্রলোক বললেন,—ওই যে সোনার বাপ রয়েছে। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ওই গরু ধরেছে। বন আগলাচ্ছে ছাড়বে কেন?

আমার ওষ্ঠাধরে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বিটবাবু কিভাবে ওকে নিয়োজিত করছে জানার আগ্রহ হল না। বললাম, বন কার সোনার বাপ?

কণ্ঠে কোন জড়তা নেই সংকোচ নেই, ঘাড় তুলে সোনার বাপ বলল,—কেনে আমার।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রামস্বামী আয়ার

রামস্বামী আয়ার তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তাঁর বয়স তখন ৪০-এর নীচে। একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। মোটামুটি ভাল মাইনে পেতেন। আমার নিজের বয়স তখন কম ছিল, তাই তাঁকে আমার বেশ প্রৌঢ় বলে মনে হ'ত। পরে নিজে সে বয়সে পৌঁছে মনে হয় রামস্বামী আয়ার বেশ যুবকই তখন। রামস্বামীর তিনছেলে এক মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে সংসার ছিল। আমাদের বাড়ীর পাশে ক্ষীরোদবাবুর বাড়ীর নীচতলায় ভাড়া থাকতেন তিনি। তাঁর বড় ছেলে গোবিন্দস্বামী, আমরা তাকে গোবিন্দ বলে ডাকতাম আর কন্যা মীরা আমাদের প্রিয় ছিল। রামস্বামীর অন্য দুই ছেলে নরসিংহ আর শঙ্করও আমাদের প্রিয় ছিল। এরা সবাই জন্মেছিল কলকাতায়! বাংলা চমৎকার বলত। গোবিন্দর তো মাছ খাওয়ার হাতে খড়ি আমাদের বাড়ীতেই হয়েছিল। রামস্বামী বা তাঁর স্ত্রী মাছ খেতেন না। যদিও আমার ছোটবোনের বিয়েতে খেতে বসে খুব ঘটা করে রামস্বামী বলেছিলেন কই আমায় মাছ দাও। একটুকরা খেয়েও ছিলেন। এছাড়া ওঁকে কখনো মাছ খেতে দেখিনি। ওঁর স্ত্রী একদম নিষ্ঠাবতী তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণবধূ ছিলেন। ওঁর ছেলেরা কিন্তু প্রচণ্ড আমিষাসী ছিল। আমার মা মাছ রান্না করে পাঠাতেন গোবিন্দর জন্য।

রামস্বামী খুব অল্পবয়সে ক'লকাতায় আসেন। পড়াশোনা বেশী দূর করেন নি। এখানে এসে উঠেছিলেন ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ী। তারপর টাইপ রাইটিং আর শর্টহ্যাণ্ড শিখেছিলেন যত্ন করে। ঝড়ের গতিতে টাইপ করতে পারতেন। উনি নিজের বাড়ীতে একটি মেশিন রাখতেন। আমরা অনেকবার তাঁকে দিয়ে খাটিয়ে নিয়েছি। উনি অম্লানবদনে আমাদের হয়ে

বেগার খেটে দিয়েছেন। ছেলেরা বাংলা ভাল বলতে পারলেও রামস্বামী বাংলা বলতেন ভাঙা ভাঙা। এছাড়া ইংরাজী এইচ্ শব্দটি হেইজ্ ধরণের উচ্চারণ করতেন। এসব নিয়ে ঠাট্টা করলে একটুও চটতেন না। বরং বলতেন আমার বাংলা নিয়ে যতই ঠাট্টা করো আমি বাংলা ঠিক বুঝি। গালাগাল দিলেই ধরে ফেলব। তারপর তিনি অনবদ্য বাংলায় গল্প বলতেন। সেবার কানপুর বদলী হয়ে গেলাম। কলকাতা ছাড়তে মন খারাপ করল। কানপুরে আমাকে Typing pool-এর চার্জ দিল। পুলের বেশীর ভাগ টাইপিস্টই বাঙালী। আমায় দেখে তারা বাংলায় বলতো 'আরেক শালা মাদ্রত এলো। আগের বাঁধাকপিটার চাইতেও বোধহয় হারামি।' এইসব কথা। কারই বা ইনচার্জকে ভাল লাগে। দিনসাতেক কাটবার পর হঠাৎ একদিন আমি একজনকে বাংলায় বললাম, চ্যাটার্জীবাবু, আপনার চিঠিটা আপনিই প্রসাদ সাহেবকে দিয়ে আসুন। বোস আর চ্যাটার্জীবাবুদের কি রকম যে মুখ হয়ে গেল তা আর বোঝাই কেমন করে। আমারাও এ গল্পে খুব হাসতাম।

আমাদের পাড়ায় অজিত গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি আসর জমাবার ব্যাপারে অদ্বিতীয় ছিলেন! আসর জমাতে গেলে একজন সহজ শিকার চাই। অজিতবাবু একেকদিন একেকজনকে ধরতেন। যেদিন যাঁকে ধরতেন তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হ'তো। একদিন আমাদের আড্ডায় এসে বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? কলকাতায় যদিও অনেক শিখ আছেন তবুও কখনো শিখ ট্রাম-কনডাকটর দেখতে পাওয়া যায় না। একইভাবে কাবলী-ওয়ালার বউ কিংবা দক্ষিণভারতীয় মড়াও দেখা যায় না। আমাদের সত্যিই মনে হ'ল আমরা কখনো কোনো কাবলীওয়ালাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখিনি। কাবলীওয়ালা বললেই মনে পড়ে লাঠি দাড়ি অনেক কাপড়ওয়ালা একটা চোস্ত। সেই ছবির মধ্যে কোথাও বৌ নেই। সঙ্গে সঙ্গে কোনো দক্ষিণভারতীয় শবযাত্রা দেখেছি বলেও মনে পড়লো না। অজিতবাবু রামস্বামীর পেছনে লাগার জন্য প্রস্তুত হয়ে খুব সাড়ম্বরে প্রশ্ন করলেন, সত্যি বলুনতো আয়ার সাহেব, আপনারা কেউ মারা গেলে কি করেন? অম্লানবদনে রামস্বামী উত্তর দিলেন 'খেয়ে ফেলি'। অজিতবাবুর রসিকতা সেদিন মাঠেই মারা গেল।

রামস্বামীর তাস খেলাতে খুব উৎসাহ ছিল। ব্রিজ ফ্লাস ফিস সব খেলাতেই তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তবে তাস খেলাতে পাশের খেলোয়াড়ের হাত দেখায় তাঁর কোনো অরুচি ছিল না, ধরা পড়েও তাঁর বিন্দুমাত্র লজ্জা দেখা

যেত না। ওঁর সঙ্গে তাস খেলতে বসলে আরেকটা অসুবিধা ছিল। কিছুতেই উঠতে দিতেন না। এই একটা last দান খেলে যাও। সে দান হবার পর দুটো দানের পর বলতেন the last, পরে হ'ত the the last। এই করে কতদিন রাত এগারটায় বাড়ী ফিরে বাড়ীর লোকের বকুনি খেয়েছি।

রামস্বামীর মেয়ে মীরার বিয়ে হ'ল অল্পবয়সে। বাড়ীতে দোলনা হলো। ছেলে স্যুট পরে বিয়ে করতে এল। আমরা দল বেঁধে মাদ্রাজী বিয়ে দেখলাম। এর আগে আমরা দিনের বেলা বিয়ে দেখিনি। রামস্বামী অনেক দিন বাঙলা দেশে থেকে বাঙালী হয়েছিল তার প্রমাণ আমাদের সবাইকে পাত পেড়ে খাওয়ালেন। নিরামিষ কিন্তু অতি সুস্বাদু। পোংগল বলে একটা মিষ্টি ছিল। অনেকটা পায়েসের মতো খেতে লাগলো। আমার ছেলে খুব আনন্দ ক'রে খেল সেই পোংগল।

কয়েকটা জিনিস কিন্তু রামস্বামী একদম বুঝতেন না। তার মধ্যে একটা হল বাংলাদেশের জমির হিসেব। উনি বলতেন কি যে কাঠা বিঘা বলো। আমাদের ওখানে Measure-এ হিসেব হয়। আমরা আবার Measureটা বুঝতাম না। রামস্বামী বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বার্গফুটের হিসেব দিয়ে কিন্তু কাঠা যত সহজে ধরতে পারি এটা পারতাম না।

রামস্বামীর প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, যখন সদাহাস্যময় লোকটি হঠাৎ কেমন গুম মেরে গেলেন। ওঁর কি রকম সন্দেহ হলো আমরা ওঁকে পছন্দ করি না। একদিন আমাকে তো ওঁর মনের গূঢ় সন্দেহের কথা বলেই ফেললেন। ওঁর ধারণা ওঁর কোনো কোনো সহকর্মী ওঁকে খুন করবার চেষ্টা করছেন। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। উনি বললেন হাসবার কথা নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কি হয় না এদেশে। আমি বললাম, ওসব পাগলামো ছাড়ুন। আপনাকে সবাই ভালবাসে। সে গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু রামস্বামী আস্তে আস্তে বদলাতে লাগলেন। ব্লাডপ্রেসায় বাড়লো। সব সময়ে বলতে লাগলেন আর কাজ করবো না। এবার দেশে যাব। দেশের গল্প করতেন। তিরুচিরাপল্লীর কাছে ওঁর গ্রামের গল্প। সেখানের নদীর বর্ণনা দিতেন। নদীটা নাকি ভারী সুন্দর। ওঁর বর্ণনা শুনে মনে হত বোধহয় যমুনা-পুলিনের বর্ণনা শুনছি। ওঁর মাথা সবসময় ধরে থাকতো। এরই মধ্যে অফিসে affidavit করে বয়স সাত বছর বাড়িয়ে নিলেন। শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি অবসর নেবেন বলে। কিন্তু ওঁর সময় যে আবার দ্রুত আসছিল উনি জানতেন না। একদিন রাত্রে শঙ্কর এসে হাজির হলো।

বিহ্বল ভাব। আমাকে বললো, কাকাবাবু বাবা কেমন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম ওঁর বাড়িতে। রামস্বামী তাঁর ঘরের মেজেতে শুয়ে আছেন। হাতমুঠো করে বারবার মেজেতে ঘুঁষি মারছেন আর বলছেন আমি বাড়ী যাব, I will go home, নান আতেকু পোওরেন সেই রাত্রেই ওঁকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হ'ল। ডাক্তার বললেন ওঁর ব্রেণে টিউমার হয়েছে। অপারেশন হ'লো। কি একটা বিভ্রান্ত টিউমার, biopsy করতে পারা গেল না। তবু ডাক্তাররা Ray নিতে বললেন। সেই রে নিয়ে রামস্বামীর সমস্ত চুল উঠে গেল। একটা পোড়া দাগ হয়ে গেল। সেই সদাআনন্দময় লোকটিকে দেখে বড্ড কষ্ট লাগতো। রামস্বামীর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আমায় বর্ণনা করেছিলেন! বলেছিলেন, আমি নার্সদের দেখতাম আর মনে হত আমার চেনাশোনা বাড়ীর মেয়েরা আমার সহকর্মিনীরা আমার সেবা করছে। কেন এমন হল বলতে পারো?

রামস্বামী অফিস থেকে স্বাস্থ্যের জন্য তাড়াতাড়ি অবসর পেলেন। ওঁর সহকর্মীরা ওকে একটি রেকর্ডপ্লেয়ার উপহার দিল। উনি বুকে করে সেটি বাড়ী আনলেন। পাড়ার সবাইকে দেখালেন। তখন উনি কলকাতায় বাস উঠিয়ে তিরুচিরাপল্লীর কাছে সেই গ্রামে যাবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু পাঠ ওঠানো গেল না। বড় আর মেজো ছেলে গেল না ওঁর সঙ্গে। ওদের তো দেশ কলকাতা। শঙ্কর আর স্ত্রীর সঙ্গে উনি তিরুচিরাপল্লী চলে গেলেন। যাবার আগে ওঁর সঙ্গে আমার মেলেডিতে শেষ দেখা হয়েছিল। উনি অনেক রেকর্ড কিনেছিলেন। দক্ষিণভারতীয় সংগীতের রেকর্ড। আমায় হঠাৎ এই প্রথম মাথায় গায়ে হাত বোলালেন। আমায় প্রথমে বাংলায় পরে সংস্কৃতে আশীর্বাদ করলেন।

এরপরে ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। ওঁর দেশে যাবার ৪০ দিন পরে ওঁর মৃত্যু হয়। ওঁর ইচ্ছামতো ওঁকে সেই নদীর ধারে পোড়ানো হয়। শঙ্কর এবং রামস্বামী বৌদি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এখন তাঁরা অন্যপাড়ায় থাকেন।

রামস্বামী তাঁর প্রিয় নদীর ধারে তাঁর বাড়ীতে ফিরেছিলেন। আমি আশা করি তিনি তাঁর প্রিয় গ্রামটিকে যে-রকমটি সুন্দর আশা করেছিলেন, সেই নদীটিকে যতটা মোহময়ী ভেবেছিলেন, বাস্তবে তারা সেইরকম সুন্দর সেইরকম মোহময়ী ছিল। আশা করি বললাম, কারণ, পরে যখন বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন সাহস করে প্রশ্নটা করতে পারিনি।

সুব্রত নিয়োগী

পতন কাহিনী

সকালবেলায় রাস্তা ফাঁকা। যানবাহনের ভিড় নেই, শব্দ নেই। রাস্তার দুধারের বাড়িগুলোর ঘরে ঘরে মানুষ ঘুম ভেঙে জাগছে। কারুর তাড়া নেই তেমন।

কাল রাত দশটা পর্যন্ত বেঁচে ছিল রিনি। এখন বেঁচে নেই। এখন ফুটেফুটে সকালে চারিদিক কেমন পবিত্র পবিত্র ভাব। রোদের তেমন তাত নেই। রাত পোহাল ফর্সা হল আর কি!

কাল রাতে আমি নিজে হাতে রিনির ঘরে রিনিকে খুন করেছি। কোথাও আঙুলের ছাপ-টাপ রেখে আসিনি। সাবধানে রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছি। সিগারেটের পোড়া টুকরো কোথাও পড়ে নেই। লাল নাইলনের টাই খুলে রিনির নরম গলায় আমি বেঁধে দিয়েছি অনায়াসে। রিনি যখন মৃত অবস্থায় সোফায় গা এলিয়ে ছিল, ওকে ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ন্যাকড়ার পুতুলের চোখের মত নিষ্পন্দ স্থির ওর চোখদুটো। সারা মুখমণ্ডলে যেন একটা ললিত স্বস্তি।

গতকাল সারাদিন আমি রিনির সঙ্গে ছিলাম। আমাকে গভীরভাবে ভালবাসত রিনি। মাঝে মাঝে লাইটার, কাফলিংক কিংবা ইম্পোর্টেড সিগারেট আমাকে উপহার দিত। সিনেমায় বা পাশে বসে কোলের কাছে লেপ্‌টে থাকত। আউট্রামের অন্ধকারে আমাকে প্রশ্রয় দিত। কখনো কখনো উইক এণ্ডে দুজনে দীঘা কিংবা ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে যেতাম। আসলে প্রচণ্ড ভালবাসাবাসিই ছিল আমার আর রিনির মধ্যে!

ঠিক সেই সময় আমার সাততলা অ্যাপার্টমেন্টের জানলা দিয়ে পুলিশের একটা কালো গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। দু চারটে উর্দিপরা পুলিশকে নামতে দেখলাম। উঁচু থেকে পুলিশগুলোকে কেষ্টনগরের মাটির পুতুলের মত শক্তিহীন মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ একটা পুলিশ কেন জানি উপরের দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমি দ্রুত জানলা থেকে সরে এলাম। তারপর দরজার পাশে মনকে দাঁড় করিয়ে লিফটের দরজা খোলার শব্দ আর কলিং বেলের আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দরজার বাইরে কে যেন বলে উঠল, সঞ্জয় সেনগুপ্তের ফ্ল্যাটটা কোথায় বলতে পারেন?

করিডোরে পায়ের শব্দ। কারা যেন কথা বলতে বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। দরজা থেকে ঠিক দশ ফুট দূরে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফার উপর বসে রইলাম।

দরজার বাইরে থেকে ভেসে আসা কিছু বুক-হিম-করা কথাবার্তা কানের কাছে বোমার মত ফেটে পড়ল।

রিনি আমাকে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে বলেছিল। জরায়ুর মধ্যেকার ছোট্ট বিপত্তি উৎখাত করার আমার বাস্তব প্রস্তাব সে মানতে পারেনি। আমার সারা মুখে থুতু ছিটিয়ে সে বলেছিল, 'সোয়াইন'।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে চারদিকে চারটে সবুজ দেয়াল। দেয়ালে সুদৃশ্য আলো। মেঝেতে কচি কলাপাতা-রঙা পাটের কার্পেট। একটা টেবিল। দুটো রিক্লাইনিং চেয়ার। টেবিলে মাছের এ্যাকোরিয়াম। জল কেটে কেটে সুখী দম্পতির মত একজোড়া মাছ খেলে খেলে বেড়াচ্ছে। এ্যাকোরিয়ামে ছোট-বড় পাথর, শ্যাওলা আর ঘাসের শীষের মত গাছ।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাছের চলাফেরা দেখলাম। তারপর রিনি আর সবার উপর আমার প্রচণ্ড রাগ হল। সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারলাম এ্যাকোরিয়ামের গায়ে। ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ল এ্যাকোরিয়ামের কাঁচ। আমার হাত কেটে রক্ত পড়ছে। লাল ঘোঁসা কালচে রক্ত। জলে টেবিল, কার্পেট ভেসে গেল। কার্পেটের উপর মাছ দুটো পড়ে ছটফট করছিল। আমি স্ত্রী-মাছটিকে হাতের তালুতে তুলে নিলাম। লাল রঙের গোল্ড ফিস। লাল মাছের লাল আঁশ। কালো পুঁতির মত দুই উজ্জ্বল

চোখ। পিচ্ছিল শরীর। হাতের মুঠো আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগলাম। মাছের লেজটা সাপের মত কিলবিল করছিল। প্রথমে মাছের এক দিককার কানকো উপড়ে দলাম, তারপর আর একটা। ঝাউপাতার ঝিরিঝিরি পাতার মত লাল টুকটুকে ঝিল্লি বেরিয়ে পড়ল। তখনো মাছের শরীরের শীতল প্রবাহ অনুভব করা যাচ্ছে।

এবার আহত মাছটিকে কার্পেটের উপর পড়ে-থাকা জলের উপর ছেড়ে দিলাম। জল পেয়ে মাছটা উপুড় হয়ে পালাতে চেষ্টা করল। আমি সুযোগ দিলাম না। আমার চোয়াল দৃঢ় হল। আবার মাছটিকে তুলে হাতের চেটোতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিতে লাগলাম। পাশের ফ্ল্যাট থেকে রেডিয়োয় কৌশিক কানাড়া ভেসে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কলিং বেল মিহিস্বরে বেজে উঠল। দরজার থেকে ঠিক দশ ফুট দূরে আরাম চেয়ারে দরজার দিকে মুখ করে আমি। দরজার নাইট ল্যাচ নড়ে উঠল। ছিটকিনি তিরতির করছে। বাইরে দিগদাগ কথাবার্তা। ভারি বুটের খচরমচর শব্দ। পাশের ফ্ল্যাটের ছোট স্প্যানিয়াল ঘেউ ঘেউ করছে। আরাম চেয়ারে নির্বাক আমি। লাশকাটা ঘরে নিঃসঙ্গ একা রিনি। আবার কলিং বেল বেজে উঠল, একবার, দুবার, তিনবার। আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। কেমন অসহায় হয়ে উঠলাম, ভেতর ভেতর একটা অজানা ভয় আমার শরীর ছেয়ে ফেলল। দরজা ধাক্কানো শুরু হল। কে যেন আমার নাম ধরে বার বার ডাকতে লাগল। আমি নিশ্চুপ। রেডিয়োতে সুখী মানুষদের জন্য সমর্পিত কৌশিক কানাড়া। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ, কান, মুখ ঝা ঝা করতে লাগল। মানুষের মত পরাধীন প্রাণী আর কেউ নেই। ক্রমাগত স্পেস ভরাট করা ছাড়া মানুষের কোন কাজ নেই। এ্যাতো মূল্যহীন এ জীবন?

এ্যাপার্টমেণ্টের চারটে দেয়াল, আকাশ-ছোঁয়া কাঁচের দেয়াল হয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। ঘরের আসবাবপত্র ছোট বড় পাথরের টুকরো, শ্যামলা ও জলজ উদ্ভিদে পরিণত হল। ধীরে ধীরে আমার প্রত্যঙ্গগুলি ঠাণ্ডা জল হয়ে যেতে লাগল। আমার গায়ের চামড়া দ্রুত শক্ত হতে শুরু করল। সারা শরীরে পাতলা প্লাস্টিকের মত ছোট ছোট আঁশ। চারদিক থেকে বরফ শীতল ঠাণ্ডা জল আমার দিকে দ্রুত ধেয়ে এসে আমার চেতনা আচ্ছন্ন করল। আমি দুবার অস্ফুটে ডেকে উঠলাম, রি-নি।

শিশির ভট্টাচার্য

ফেরা

তৃতীয়বার হাতঘড়িটার দিকে তাকালো পলা। দশটা বেজে সাতাশ মিনিট। এবার একটু অধৈর্য হয়ে উঠল সে। একটু চিন্তাও যে না হচ্ছে তা নয়। এত দেরী করে না ও কখনো। ঠিক দশটার সময়ে এসে পৌঁছুবার কথা হাওড়ার সুবার্বান স্টেশনের টিকিট ঘরের কাউন্টারের সামনে। স্থান ও কাল কপিলই নির্বাচন করেছিল। আগের মত এবারও কথা ছিল দশটা থেকে দশটা দশের মধ্যে এসে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে দুজনেই। হাওড়া ব্রিজের ওপরটায় অবশ্য এই সময়টা বেশ একটু ভিড়ই হয়, বাস, লরী, প্রাইভেট-কার, রিক্সা সব মিলিয়ে। তবে ট্রাফিক জ্যাম ঠিক এই সময়টা বড়ো একটা হয় না। সেটা হয় আরো একটু বেলায়। আর বিকেলের দিকটাতেই বেশী। এই সময়টা ভিড় থাকলেও সেটা হয় সচল ভিড়। আর তার গতিও সাধারণত থাকে কলকাতার দিকে।

সত্যি এই সময়টাতে ডালহৌসী স্কোয়্যার অঞ্চলটাকে মনে হয় যেন একটা বিরাট চুম্বকের মত। রেলে, ট্রামে, বাসে, রিক্সায়, সাইকেলে, হাঁটাপথে হাজার হাজার মানুষকে সে যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণে নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে নেয়। আবার বিকেলে ঠিক তার উল্টো। তখন হয় বিকর্ষণ।

দশটা বত্রিশ।—নাঃ, এইবার রেগে ওঠে পলা।

এতক্ষণ কি একটা মেয়ের পক্ষে কোন এক জায়গায় একলা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা সম্ভব? কপিলটা যেন কি! এই কি প্রথম নাকি! প্রতিবারই আসতে দেরী করে সে। আর এসেই এমন এক-একটা কৈফিয়ৎ-এর ভনিতা শুরু করে দেয় যে রাগের বদলে হাসিই পায় পলার শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এতটা দেরী করেনি সে কখনো। আর পলাও আজ এসে পৌঁছেছে দশটা বাজার মিনিট সাতেক আগেই। একটু আগে না বেরুলে কি আর রক্ষে আছে! আরো মিনিট দশেকের মধ্যেই তো আরতি, অঞ্জলি

ওরা সব বেরিয়ে পড়ে। আর একসঙ্গে অফিসের পথে দেখা হওয়ার পরও যদি পলাকে অফিসে না দেখতে পায় ওরা, তবে সওয়া এগারটায় কলঘরের আড্ডায় মেয়েদের যে উৎসাহিত জল্পনার সুরু হবে এবং আরো আধঘন্টার মধ্যে ডি. বি. আই অফিসের বাকি মেয়েরা তো বটেই, দু' চারজন ছেলের কানেও তা গিয়ে পৌঁছুবে।

সেকশন্ সুপারিনটেনডেন্ট সোমেশ চক্রবর্তী'র মুখটা মনে পড়ল পলার। একটু খিটখিটে মেজাজের প্রৌঢ় মানুষ। কিন্তু মনটা বড়ো ভালো। স্টাফ অ্যাবসেন্ট থাকলে অনেক সময়ে নিজেই কাজ টেনে নেন। পলাকে ভারি স্নেহ করেন ভদ্রলোক। তার কারণ অবশ্য এই যে, পলার টেবিলে কখনো ফাইল আটকে থাকে না। আর ও কোন কাজেই না বলে না। অবশ্য এ ছাড়া আরো একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে সোমেশবাবুর মেয়ে বাণী পলার স্কুলের সহপাঠিনী ছিল এককালে। বাণীর অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। যোগসূত্রটা সোমেশবাবুই আবিষ্কার করেছিলেন একদিন। বাণীর স্কুলের সোশাল ফাংশানে তোলা পুরানো একখানা গ্রুপ ছবির ভেতর থেকে।

সোমেশবাবু এমনিতে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেন, কিন্তু কেউ ছুটি চাইতে গেলেই মুখের এমন চেহারা করেন যেন মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁর নিজের মানিব্যাগ খুলে কাউকে বাধ্য হয়ে খয়রাতি করতে যাচ্ছেন। নিজেও পারতপক্ষে কামাই করেন না ভদ্রলোক। গতকাল পলা যখন একটু কুণ্ঠিতভাবেই তার কল্পিত মামাতো দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনের উপলক্ষটা উল্লেখ করে একদিনের ছুটির দরখাস্তটা এগিয়ে দিল তখন কান দুটো ওর হঠাৎই গরম হয়ে উঠেছিল। ভারী নার্ভাস বোধ করে পলা এ সব ব্যাপারে। মিথ্যে কথা বলা ওর একদম অভ্যাস নেই। সোমেশবাবু মুখটাকে করুণ করে বললেন,—আবার ছুটি!

যেন পলা দিনদুই আগেই ছুটি নিয়েছে একবার। আগের ক্যাজুয়াল লিভটা নিয়েছিল ও প্রায় পৌনে দু'মাস আগে। সেটাই কপিলের সঙ্গে ওর প্রথম অফিস পালানো।

কথাটা মনে হতেই ভীষণ হাসি পেল পলার। আবার অমন ভালো মানুষের কাছে মিছে কথা বলার জন্য একটু খারাপও লাগলো। এখানেই

কপিলের সঙ্গে পলার মেলে না। কপিল ওর সততার এই বাড়াবাড়ি নিয়ে মন খারাপ-টারাপ দেখলে হাসে। বলে,—আরে অত সেন্টিমেন্টাল হলে কি দুনিয়ায় টিকে থাকা যায়? পৃথিবীতে মরালিস্টদের যুগ আর নেই এখন বুঝলে? মিছে কথা বলা বন্ধ করলে স্টক এক্সচেঞ্জ তুলে দিতে হয়। বিজ্ঞাপনগুলো সব আগে নিষিদ্ধ করতে হয়। রঙ্গিমালের বিজ্ঞাপনই সবচেয়ে উঁচুগলা তাই না! সুদ নেওয়া অন্যায় বলে কি ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ করে দিতে বল?

তর্ক করে না পলা ওর সঙ্গে। কপিলের যুক্তিগুলো ওর কাছে হাস্যকর মনে হলেও স্বীকার না করে পারে না যে, কি জোরালো ওর বিশ্বাস। যাকে বলে 'স্ট্রেঞ্জেস্ট্ কনভিক্শান্'। ভেবে পায় না পলা, কপিল এই অদ্ভুত মনের জোর পায় কোথায়! বয়স হিসেবে বড় জোর বছর দু'য়েকের বড় হবে কপিল। ওর তেইশ, আর কপিল পঁচিশ। পড়াশোনা বি এস সি পার্ট ওয়ান পর্যন্ত। তারপর আর পড়ল না ও।—'পড়ে কি হবে!'

অথচ মোটামুটি মেধাবী ছাত্রই ছিল ও। আর পলা ইকনমিক্স-এর এম এ। তবু তুলনামূলক বিচারে পলা দেখেছে মামুলি সাধারণ জ্ঞান থেকে শুরু করে বিশ্বদুনিয়ার তামাম খবরাখবর পর্যন্ত কোন জায়গাতেই ও কপিলের ধারে কাছে এগুতে পারে না। কত নির্ভরযোগ্য মনে হয় যেন ওকে। জিজ্ঞেস করলে বলে,

—জানো পলা, আমার শিক্ষাদীক্ষা শক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। আই লার্ণট্ ইট দি হার্ড ওয়ে।

কথাগুলো অনেকটা পাকাপাকা মনে হয় পলার। তবু ভাবে কথাটার কোথাও হয়তো সত্যি আছে। বাড়ীর অবস্থা খুব একটা অস্বচ্ছল নয় কপিলদের। তবু অল্প বয়স থেকেই রোজগারে নেমেছে ও। প্রায় সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ইলেক্ট্রিকাল সাজ-সরঞ্জামের ছোটখাট একটা দোকান দিয়েছে ও। এবং সেটার পেছনে অসাধারণ পরিশ্রম করে। তাই একথা বলার কিছুটা অধিকার হয়তো ওর আছে। আজকাল আবার রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামায় কপিল। এবং প্রায়ই পলাকেও এসব সম্পর্কে দুচার কথা বলে। পলা অবশ্য ওর সব মত ঠিক মেনে নিতে পারে না। কিন্তু উল্টোদিকে কোন যুক্তিও খুঁজে পায় না অনেক সময়।

কপিলের মতে এদেশের ঘুণধরা সমাজ-ব্যবস্থা নতুন করে সাজাতে হলে

নাকি কোন ক্রমিক সংস্কারের দ্বারা তা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলে আবার তা গড়তে হবে। কপিল বলে,—'তোমাদের সমাজে সবাই ট্রামবাসে ছাত্র কনসেশানের দরবার নিয়ে বাজার মাত করো। অথচ ছাত্র কারা আমাদের এখানে! কার পয়সায় তারা ট্রামবাসে চড়ে। তাদের বাপেরা সমাজের কোন্ স্তরের প্রতিনিধি! একটা চাষী বা দিনমজুর তার ছেলে মেয়ের জন্যে এই এই সুবিধা পাক তা কেউ বললে না তো! এ দেশের একটা মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশের নাম মধ্যবিত্ত। তাদের কিছু ছেলেমেয়ে লেখা-পড়া শিখে কাজ পাচ্ছে না তাই কোন কোন লোকের ঘুম হচ্ছে না। এদের বেকারত্ব ঘুচলেই যেন দেশের সব সমস্যার সমাধান। আর বাকী সত্তর ভাগ লোক যে অনশন অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে তাদের কথা কে বলে!

—উঃ। অসহ্য বোধ করে পলা। মাথা ধরে যায় ওর যেন এবার। কিন্তু এ কি! দশটা চল্লিশ হল প্রায়। শ্যাওড়াফুলি লোকাল ইন্ করেছে এইমাত্র। জলস্রোতের মতো মানুষ বেরিয়ে আসছে সেদিক থেকে। মেয়েলি গলায় ঘোষণা শোনা গেল ঃ

—চার নম্বর প্ল্যাটফরম্ থেকে ব্যাণ্ডেল লোকাল দশটা পঞ্চান্নতে ছাড়বে। চার নম্বর প্ল্যাটফরম্ থেকে……

ফুটপাতের ফলওয়ালাটা এতক্ষণে তার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে আরম্ভ করেছে পলার মনে হল। নাঃ আর দাঁড়ানো যায় না। তার উদ্বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কি যে করে সে এখন! এখন আর অফিস যাওয়ার সময় নেই। বাড়ী ফেরাও সম্ভব নয়। তাহলে পাঁচশো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে মা ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কলেজের বন্ধুদের কারো বাড়ী যাবে নাকি! কপিলের সম্বন্ধেই বা কোথায় খোঁজ করে ও।

—"মাফ করবেন। আপনার নাম কি পলা চক্রবর্তী? কপিলের কাছ থেকে……"

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলো পলা। ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো কপিলেরই সমবয়সী একটি ছেলে পরনে ডোরাকাটা খয়েরী হাওয়াই শার্ট ও সাদা ট্রাউজার—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। খানিকটা ইতস্তত করেও অস্ফুট ব্যগ্র কণ্ঠে পলা বললো,—"হ্যাঁ। কপিলের কি হয়েছে?"

—না না, কপিলের হয়নি কিছুই। ওর দোকানে যে ছেলেটা কাজ

করে সে হঠাৎ বাঁশের মই থেকে হড়কে পড়ে গিয়ে বোধহয় হাতটা ভেঙেছে। কপিল তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলো। আঘাতটা নাকি বেশ জোরেই হয়েছে। পায়ে আর মাথায়ও লেগেছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো পলা। উত্তেজনা, উদ্বেগ সব মিলিয়ে ওর বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছিল যেন এতক্ষণ। এবার সত্যি সে একটু ক্লান্তি অনুভব করলো। আস্তে আস্তে বললো,—"তা আপনাকে কি করে…"

—"আমার নাম সুজয়। সুজয় লাহিড়ী। কপিল চৌধুরী আমার—আমার বিশেষ বন্ধু।"

আশ্চর্য কপিলের যে এমনি এক বিশেষ বন্ধু আছে পলাকে গত দেড় বছরের পরিচয়ে একবারও ও জানায় নি তো! সুজয় হয়তো কথাটা অনুমান করে। তাড়াতাড়ি বলে, "না স্কুল কলেজের পরিচয় নয়। পরিচয় পাড়ার ক্লাবের। মানে আড্ডার। বউবাজারে কপিলদের বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী। হাসপাতালে যাবার পথে আমাকে ডেকে বলে গেল। আপনার কথা আমি অবশ্য অনেক শুনেছি ওর কাছে।"

—"আমার কথা অনেক শুনেছেন ওর কাছে! কই আপনার কথা কখনো আমাকে বলেনি তো ও।"

—"বলেনি তো! এই দেখুন, ভারী মজার ছেলে এই কপিল। তা এখানে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন নিশ্চয়ই। কোনদিকে যাবেন?"

এ প্রশ্নটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়তে পারে পলা ঠিক খেয়াল করে নি। হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়েই যেন ও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। চোখের সামনে আবার অফিসের কলঘরের জটলাটার ছবি ভেসে ওঠে। আর পাশাপাশি সোমেশবাবুর মুখখানা—আবার ছুটি! অন্নপ্রাশন—ভেসে ওঠে তেতাল্লিশের বি মদন মিত্র লেনের রান্নাঘরে মায়ের ব্যস্ত মুখ। নাঃ এখন এই সময়ে কোথায় যে যাওয়া যায়!

—"কোনদিকে যাবেন?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে সুজয়। আবার বলে, "বলছিলাম কি, খুব তাড়া না থাকলে এক পেয়ালা চা খাওয়া যেত।"

হাওড়া স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোরাঁটা খুব খারাপ নয়। এতক্ষণে খেয়াল হয় পলার যে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ—এক যুগ।

দুই যুগ, কি আরও বেশী। আর পা দুটো টনটন করছে তার। গলা শুকিয়ে কাঠ—অনেকক্ষণ থেকেই ক্লান্তিতে, বিরক্তিতে, উদ্বেগে। তবু মুখে কিছু প্রকাশ না করে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে,—"আপনি কি বাড়ীর দিকে যাবেন?"

সুজয় হঠাৎ একটু জোরেই হেসে ওঠে।—"ধরেছেন ঠিকই। আমি বেকার। বি কম পাশ করে বসে আছি বছর দুই। কপিলের ভাষায়—পেতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সৌখিন বেকার এক ছেলে। সকাল সন্ধ্যে দুটো ছাত্র পড়াই। হাত খরচটা চলে যায়। আর বাকিটা বাবার হোটেলে। সুতরাং বাড়ী ছাড়া এখন আর কোথায় যাব।"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পলা বলে ওঠে—"আরে না না, আমি একটু লাইব্রেরীর দিকে যাব ভাবছিলাম, বেলভেডিয়ারে। তা চলুন, এক পেয়ালা চা হলে ভালই হয় এখন।"

—"আরে বাঃ। আমিই তো আপনাকে বললাম।"

—"উঁহুঁ, লেডিজ ফার্স্ট। আপনি জানেন না!" পলা ঘাড় নাড়ে।

—"আচ্ছা, ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।" সুজয় বলে—"আমি চায়ের দাম আর আপনি বাসের ভাড়া কেমন!"

একটু হেসে পলা সম্মতি জানায়। হঠাৎ নিজেকে যেন খানিকটা বাচাল মনে হয় ওর। মনে মনে বলে, "কে বলে আমি কথা বলতে পারি না। এই তো বেশ বলছি।"

রেলওয়ে আমিষ ভোজনালয়ের ডানদিকের কোণার এক টেবিলে এসে বসে ওরা মুখোমুখি।

—"হাত মুখ ধোবেন?" সুজয় জিগ্যেস করে অত্যন্ত সহজভাবে। যেন পলার সঙ্গে তার কতদিনের আলাপ।—"ঐ কোণায় আছে ওয়াশবেসিন।"

—"নাঃ, দরকার নেই।" পলা মাথা নাড়ে। দীর্ঘ সময় পর আরামপ্রদ একটা বসার আসন পেয়ে পলা যেন গা এলিয়ে দেয়। মনে মনে সুজয়কে ধন্যবাদ জানায় ও। এতক্ষণে ভালো করে দেখে নেয় পলা। একটু লম্বাটে চেহারা। রোগাই বলা যায়। শরীরের তুলনায় হাত দুটো বেশী বলিষ্ঠ একটু। মুখশ্রী মোটামুটি কিন্তু চিবুক ও কপালের গড়ন ভারী সুন্দর।

পেছনে ঠেলে আঁচড়ানো একরাশ কোঁকড়ানো রেশমের মত নরম চুল। গায়ের রং কালো ঘেঁসে হলেও সপ্রতিভ চেহারায় কেমন একটা সতেজ উজ্জ্বলতা। চোখ বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু সরল। ওপরের পাটিতে ডানদিকে একটা গজদন্ত থাকায় ঠোঁটটা একটু ফাঁক হয়ে থাকে ও তার ফলে মুখটা একটু হাসি হাসিই দেখায়। জামা-কাপড়ে সাদাসিদে হলেও মানুষটি অত্যন্ত সচেতন বোঝা যায়।

—"কি খাবেন, চা না কফি।" সুজয় শুধোয়।

—"চা-ই ভালো লাগে আমার।" বলেই পলার মনে পড়ে যায় কপিল কফি বেশী পছন্দ করে। আর তারপর আবার তাড়াতাড়ি বলে—"কফিতেও কিছু আপত্তি নেই অবশ্য।"

—"আপনিই বললেন, লেডিজ্ ফার্স্ট; সুতরাং চা-ই আনানো যাক।"

পলা হাসলো একটু। আবার হঠাৎ তার মনে হল সে একটু বেশী প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছে যেন এই স্বল্প পরিচিত যুবকটির কাছে। তার বড় পিসীর দেওরের ছেলে কপিল। পিসীর সঙ্গেই কোন এক উপলক্ষ্যে পলাদের বাড়ী এসেছিল বার কয়েক। কিন্তু তার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে অনেক সময় লেগেছিল পলার। পলা অবশ্য এখনও কথা কমই বলে। কারণ কপিল এত বেশী কথা বলে যে, আর কারো বলার দরকার হয় না। মাসে বার দুয়েক সাক্ষাৎ হয় পলার সঙ্গে তার। সেদিন ছুটির সময়ে জি পি ও-র সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কপিল তার জন্যে। কিন্তু আজও পলা বুঝে উঠতে পারে না কপিল ঠিক কি প্রত্যাশা করে তার কাছে! অথবা সেই বা কি চায় কপিলের কাছ থেকে? আশ্চর্য একথাটা ঠিক এই মুহূর্তে আজ তার মনে হচ্ছে কেন? তবু একথা সত্যি শুধু বন্ধুভাবেই কি মেশে নি! কোথাও বসে চা অথবা অন্য কিছু খাওয়া। রাস্তায়, ইডেন গার্ডেনে কিংবা গঙ্গার ধারে একটু-আধটু ঘুরে বেড়ানো আর তারপর একসঙ্গে বাড়ীর দিকে ফেরা। অবশ্য কপিলই তাকে এগিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ দিন বিবেকানন্দ স্ট্রীট আর বিধান সরণীর মোড় অবধি। ব্যস্ এর বেশী কিছু নয়, কিন্তু পলাও কি তার এই সওয়া দুই বছরের চাকরী জীবনে শুধু কেরিয়ার ছাড়া আর অন্য কিছুর স্বপ্ন দেখেছে! কই সচেতনভাবে মনে তো পড়ে না। গতবারে অফিস পালিয়ে ট্রেনে করে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবটা অবশ্য কপিলেরই ছিল। প্রথমটা ভয় ভয় করলেও পলার খুব ভালোই লেগেছিল তার সঙ্গে সমস্ত দুপুরটা টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। এবারকার প্রস্তাবটা তাই পলার দিক থেকেই ছিল।

কিন্তু নিছক বেড়ানোর আনন্দ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না তার মধ্যে। তবু গত এক সপ্তাহ ধরে পলা মনে মনে এরই জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। আজকে কপিলের হঠাৎ অনুপস্থিতি তাই কি ওকে খুব নিরাশ করেছে। হতে পারে। কিন্তু তবুও গত দেড় বছর ধরে এই অজস্র ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কি এমন কোন সুন্দর মুহূর্ত কখনো আসেনি যখন দুজনেই তারা আরও একটু ঘনিষ্ট হতে পারতো! মনের তলায় হাতড়ে দেখতে চাইল পলা এবং কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করল—হয়তো পারতো। কিন্তু তার স্বভাবগত সংকোচ আর ভদ্রতা জ্ঞান তাকে আর এগোতে দেয়নি। কিন্তু কপিল। কপিল তো এগিয়ে আসতে পারতো। সে তো পুরুষ। আর সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় পলা, মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠবের বিচারে অনেক আগের সারিতেই পড়ে। কি জানি। এখন এই মুহূর্তে পলার মনটা অকারণ ভারী হয়ে ওঠে আবার।

—"আরে চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে। ভাবছেন কি অত? চা বানানো অভ্যেস আছে তো! না কি আমি তৈরী করবো!"

—"না, না।" অপ্রস্তুত হয়ে বলে পলা। তারপর দ্রুত হাতে চা ঢালতে শুরু করে পেয়ালায়। কণ্ঠস্বর একটু লঘু করে ফের—"আমি রান্নার কাজটাও ভালই করতে পারি। বিশ্বাস না হয় প্রমাণ দিতে পারি মশাই।"

—"তাই নাকি!" সুজয়ের দৃষ্টিতে একটু বিস্ময়। কারণ পলার কণ্ঠস্বরের অকারণ লঘুতায় আশ্চর্য হয় সে। আবার বলে, "সে সৌভাগ্য কি আর আমার বরাতে হবে?"

নিজের কণ্ঠস্বরের চাপল্য পলার নিজের কানেও অস্বাভাবিক লাগে। তবু সে তরল কণ্ঠে বলে ওঠে,

—"নিশ্চয়ই। আসুন না একদিন আমাদের বাড়ী কপিলের সঙ্গে। কবে আসবেন বলুন।"

উত্তর দেয় না সুজয়। একটু হাসে শুধু। ও জানে, পলা ওর উত্তর সত্যিই চায় নি। তবু তার হাসিটা পলার কাছে আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হয়। মনে হয় আজ ওকে কথা বলতেই হবে। মাথায় যেন ভূত চেপেছে ওর। অনর্গল বকতে ইচ্ছে করছে আজ।

—"এখন ঠিক সময় কত?" নিজের ফর্সা, সুদৃশ্য মসৃণ মণিবন্ধে বাঁধা ছোট্ট গোল হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে পলা।

—"এগারটা তিপান্ন", সুজয় জবাব দেয়।

—"আপনার খিদে পায় নি?"

—"না তো। আমি বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। কলেজ স্ট্রীটে এক বন্ধুর দোকানে যাওয়ার কথা ছিল। কপিল হঠাৎ গিয়ে বললো, আপনি রাস্তায় অপেক্ষা করবেন। আপনাকে খবরটা দিয়েই যেন অন্য কাজে যাই। আপনার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। আনতে বলি কিছু।"

—"না, না। আমার সঙ্গে তো অফিসের টিফিনই আছে। ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়তে আপনার ভালো লাগে!"

—"হ্যাঁ। কাছাকাছি কোথাও যেতে মন্দ লাগে না। দূরের যাত্রা বোরিং মনে হয়। আপনার?"

—"আমার দারুণ ভালো লাগে।" সঙ্গে সঙ্গে গতবারের ব্যাণ্ডেল ভ্রমণের ছবি পলার সামনে ভেসে ওঠে। লিলুয়া—বেলুড়—দক্ষিণেশ্বরে এক মিনিট স্টপেজ—বাসন্তী চানাচুর—কলা—ডাব—চা গরম—ব্যাণ্ডেল চার্চের সামনে সবুজ মাঠ, তিনটে কৃষ্ণচূড়া গাছ, গঙ্গার হাতছানি, চার্চের ভেতর গুহা, ছাতের ওপর বেদীতে মোমবাতি জ্বালানো। কোত্থেকে দুটো মোমবাতি নিয়ে এল কপিল। বলল,—"পলা তুমি একটা আর আমি একটা জ্বালিয়ে দিই এসো।" অথচ পলা জানে কপিল ভগবানে বিশ্বাস করে না এবং পলা বিশ্বাস করে।

—"ওসব মূর্তি-টূর্তি ভেঙে দেওয়াই উচিত বুঝলে পলা! ওগুলো হচ্ছে আড়াল। মহৎ লোকের মূর্তির আড়ালে বসে যতো ভণ্ডের দল শয়তানীর কারবার চালায়। আর সবাইকে উপদেশ দেয় অমুকের মত হও। মরালিস্ট্-এর পোষাক পরা যত ইমমরাল সব।"

কি আশ্চর্য! পলার মাথা ঝিম ঝিম করে। ও উঠে পড়ে। দাঁড়িয়ে বলে,—"চলুন বেরোই।"

চায়ের দাম দিয়ে বাইরে আসে সুজয়। জিগ্যেস করে—"কত নম্বর বাস।"

—"বাস নয় ট্রেন। আসুন।" এই বলে অবাক সুজয়কে এক রকম টানতে টানতেই টিকেট কাউণ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলে,—"দুটো ব্যাণ্ডেল জংশন।"

আর সময় নেই পলার। তাকে স্বাভাবিক হতেই হবে। আলোজ্বলা কাঁচের বোর্ডটার দিকে তাকালো ও। ব্যাণ্ডেলগামী পরের ট্রেনটা ছাড়তে আর মিনিট ছ'য়েক মাত্র দেরী।

জীবন সরকার

বৃষ্টির শব্দ

১. মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন

২. ঘরে বসে অনুপম হাটের কথা ভাবছিল। এই বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই হাট বসবে না। এই কয়দিনের বৃষ্টিতে চারপাশে পুকুর নদী হয়ে গেছে। নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এমনিতে বর্ষা এবার খুব দেরীতে এসেছে। অনুপমের ইচ্ছা করছে না এই বৃষ্টিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু না গিয়ে কোন উপায় নেই। ঘরে বসে থাকলে তো খাওয়া জুটবে না। এই বৃষ্টিতে ভিজলে যদি অসুখ করে। এই কথাও ভাবলো অনুপম। কারণ অনুপম জানে জ্বর এলে বিপদ। কে দেখবে। আছেই বা কে? অনুপমের বুকটা ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল।

৩. টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে। চোখ বুজে থাকলে কি ভাল লাগে। ঘুম এসে যায়। টুপটাপ একটা বাজনা বাজছে। ঘরের দিকে তাকাল অনুপম। বিছানাটা খালি। উত্তরদিকে কোলবালিশ। পূর্বদিকে মাথার বালিশ উদাস হয়ে কাঁদছে। ঘরে জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই। একটা স্টোভ একটা সুটকেশ। আলনা এইসব। এই উত্তর তিরিশে এসে কেউ দেখল না অথচ বাইরে বৃষ্টি।...

৪. খুব অল্প বয়সে আমি রাজা। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সাত সমুদ্র তের নদী, অশ্বশালে অশ্ব, মল্লশালে মল্ল, হস্তীশালায় হস্তীর গল্প শুনতে ভালোবাসতাম, সেই থেকে আমি শ্বেত পালঙ্কে রাজকন্যা। শুভ্র

গোলাপ আর শ্বেত হস্তীর প্রতি ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করতাম। আমার শৈশব কেটে গেল। কৈশোরে আমি সমুদ্র দেখেছি। দীঘায় ছিলাম অনেকদিন। আর যৌবনে পাহাড় দেখেছি উত্তর বাংলায়। চা বাগানে বনভোজন করতে করতে যৌবন যে যায় যায়।

৫. মেয়েমানুষ—আপনি নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ ও একা মনে করেন।

অনুপম—হ্যাঁ, আমি ভীষণ একা, আবার কখনও মনে হয় আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী। কখনও মনে হয় কতো অসহায় এবং একা।

মেয়ে মানুষ—আপনার সঙ্গে আলাপ করে কি যে আনন্দ লাগছে।

অনুপম—আপনার উড্ডীন চুল, আপনার হংসমিথুন শাড়ির আঁচল···আমার ভাল লাগছে।

মেয়ে মানুষ—আপনি কি ভালবাসেন?

অনুপম—শৈশবে প্রজাপতি, এখন সমুদ্র।

মেয়ে মানুষ—মানুষ।

অনুপম—না, আমার ভাল লাগে বৃষ্টির শব্দ। জলের শব্দ। সুন্দরী, তুমি এখন যেতে পার। আমার পালে পাগলা হাওয়া। আমার নৌকা সকলের জন্য নয়।

৬. মিছা মায়া এ সংসার কেউ কার নয়
পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয়
টাকাকড়ি ধনজন সঙ্গে নাহি যাবে
একাকী এসেছ তুমি একা যেতে হবে

৭. আমি অনুপম এই ঘাট থেকে সহজে যেতে চাই না। কেননা ঘাটে নৌকা বাধা রয়েছে। বাণিজ্য করতে অনেক দূর যেতে হবে। আমি অনুপম সহজে তোমাকে ছেড়ে যাবো না। আমি ভালবাসি বৃষ্টির শব্দ। আমার মন্ত্র বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি হলে মাটি উর্বর হয়। মাটি নরম হলে ধান্য রোপণ করা হয়। ধান্য থেকে চাল—চাল থেকে অন্ন। অন্ন খেয়ে মানুষ বাঁচে। মানুষ পৃথিবীকে বাঁচায়। সুতরাং আমি বৃষ্টির শব্দ চাই। আমি বৃষ্টির শব্দকে ভালবাসি।—বৃষ্টি সে যে আমার গহীন গাঙ। আমি গহীন গাঙে ডুইব্যা মরি। সুতরাং বৃষ্টির শব্দ—আমার পৃথিবীময়।

অনীশ ঘোষ

কলকাতা হাসপাতাল

এখানে চারপাশে বড় বেশী হাসপাতালের
শান দেওয়া গন্ধ কাঁটার মত
বুকে বিঁধে থাকে। সাদা কাপড়ের মোড়কে
বাঁধাই শরীরগুলো যত্ন করে
'কফিনে' পুরে ফেলা হয়।

'ছুটির পরে একটাও নয়'
তারপরে সব অনাহূত সন্তান ঈশ্বরের।
কেউ নেই ঃ
মলমের মত স্নিগ্ধ কোন প্রলেপ
ঠান্ডা করে দেয় না
দগদগে ঘায়ের মত জীবন!
সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে
শহরের বাতাসে।
আঃ কতদিন ভাতের গন্ধ পাইনি!

এখন তৃতীয় পুত্র হাসপাতালে
দূষিত রক্ত নিয়ে শেষ মুক্তির অপেক্ষায়
স্থির হয়ে থাকে।
অথচ, পৃথিবীর প্রসব যন্ত্রণা ত্বরান্বিত হয়।
হা ঈশ্বর, তুমি অশ্বত্থ পাতার আড়ালে
লজ্জা নিবারণ করো।।

জন্মভূমি

আমার কোনো দুঃখ নেই
সে-এক দুঃখ ছাড়া
দুঃখ মানে আর কিছু নয়
শীর্ণ চোখের ধারা।

ঃ দুঃখ তুমি কী চাও?
কোথায় থাকে সে?
দুঃখ কাঁদে ঃ বুঝলো না কেউ
—হিজল-ছায়ার দেশে!

প্রফুল্ল মিশ্র

অথচ বলা হয় একা নয়

অথচ বলা হয় একা নয় কেউ।
হাটের হাজার ভিড়ে
তবু একা একা হাঁটে কেউ
সমস্বর কানে তার বাজে নাকো
এই স্বর কোলাহল ঃ

তাহলে কি সঙ্গী নয় কেউ কারো আজো?
এইসব জন-মন বটের ছায়ার আন্দোলন
ভাঙা হাট হয়?

তাহলে সে কোনো শ্রুতি, কোন শ্রুতি
শোনার ইচ্ছেয় পাতে কান ঃ
কী করে কখন তার
বুকের ইসটিশানে
গুম গুম ট্রেন পৌঁছোবে?

বিনোদ বেরা

সাম্প্রতিক আমি

আস্তে আস্তে একদিন বুঝতে পারি
অন্ধের মত একই জায়গায় ঘুরছি,
অবিরল সামনে যাবার চেষ্টায় অস্থির
অসাড় নিঃসাড় স্বপ্নে ও ঘুমে চলার বিরাম ছিল না।
মনে মনে ভাবি উদ্দাম সহর নগর ছাড়িয়ে
চেনা পৃথিবীর মত্ততার নাগালের বাইরে
অনেক অনেক দূরে চলে যাবো।

একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে
চাষবাস ক্ষেতখামার পশুপালন পত্নীপুত্র নিয়ে
গৃহস্থ হওয়ার বাসনা জাগে আমার,
সরল সুন্দর শ্রমের স্নিগ্ধ মন্থর প্রহরগুলি…
শস্যক্ষেতের শোভা ও সঞ্জয়
মনে প্রাণে যত পল্লবিত হতে থাকে
ততই আমার কাছে সভ্যতার ছলনা লোভ মায়াবী তৃষ্ণা
অসার প্রতিপন্ন হয়।।

মিঠু মুখোপাধ্যায়

অজ্ঞাতবাস

সব কিছু ফেলে রেখে যেতে হবে এক বিনম্র প্রার্থনা সভায়
বুকের ব্যথা বিশাখা তোমার চোখ বাগানে সবুজ অপরাজিতা
সব কিছু সব শব্দ হাতে হাতে ফিরে যাবে তখন
একাকিনী বিশাখা তুমি আরক্ত পায়ে
হেঁটে যাবে কোনো নির্জন শ্মশানে

চেতনা বা মধ্যবিত্ত প্রকোষ্ঠে আগুন জ্বেলে
এক দমকল ফিরবে উল্টো পথে
চেনা চেনা যত মুখ চেনা সময় সবই চলে যাবে
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে।
দ্রৌপদীর মলিন মুখ নিসর্গ বিষণ্ণ

ধ্বনি কিম্বা শব্দহীন বিছানায় ভীষণ একগুঁয়ে হা ঈশ্বর

অভিজিৎ ঘোষ

সৈনিকের ডায়েরী

আমি ভ্রষ্ট নষ্ট এক কবি
চিরকাল তোমার ঐ ছবি
রক্তাক্ত আঘাতে চূর্ণ করে দেব

উড়ন্ত পাখীর ঐ তীব্র চীৎকারে
কেঁপে উঠবে দিনমান, আকাশ বিদ্যুৎ
অন্ধকার হ'বে মূক, ছায়ারা আঁধারে
ছুটে যাবে সভ্যতার ভিত্ ভেঙ্গে দিয়ে……

এখন তোমার মুখ
জোনাক্ পোকার মতো অস্পষ্ট, অসাড়
শূন্যে মিশে গেছে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অনিন্দ্য পরমা

অনিন্দ্য মৃত্যুর পর অপরূপ উৎসবের মত তুমি আস
আমার আঙিনা ভরে পল্লবিত ঋতুর সম্ভারে
সমাহিত পূর্ণতায়। তখন আর আমি কোনো হৃদয়ের ঝড়ে

রক্তের নির্মোহে বাইরে বেরোবে না,
চেতনা ও চেতনার সমস্ত উল্লাসও
স্তব্ধ হবে তোমার ঐ অতল উৎসারে।
যৌবনের স্বর্ণস্বর কানে কানে বলেছে ঠিকানা—
জীবনের অভিপ্রায় জয় বা বিজয়ে নয়, নম্র প্রণিপাতে,
প্রশ্নহীন সমর্পণে, তাহলেই আঙিনায় আশ্চর্য অজানা
একটি আলোক এসে সব কিছু মুছে দিতে পারে
সমস্ত ম্লানতা-ভয়-দুঃখ-ব্যথা। স্থানির্মল শুশ্রূষার হাতে
যন্ত্রণারা ফুটে উঠতে পারে যে যথীতে,
অপূর্ণতা, পূর্ণতার ধ্যানে।

এই সব জলধারা জীবনের রুদ্ধ জ্যামিতিতে
ফসল ফলায়, আনে সবুজ সোনার
স্থির দীপ্ত সমারোহ ঃ অনিন্দিত গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে
এই সব লেখা আছে। প্রাণ হয় প্রসন্ন বিস্তার।

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোশ

চলতি পথে দেখা
অনেক অচেনা মুখের ভীড়ে
একটি চেনা মুখ
দু চোখে আলো নিয়ে
এগিয়ে গেলুম যেন
শরীরের চেয়ে বেগে
বললুম চিনতে পারছেন ?
চেনা মানুষটি অতি কণ্ঠে
অচেনার মতন বল্লেন
ঠিক চিনতে পারছি না

তবে মনে হচ্ছে কোথাও যেন
দেখেছি, মনে আসছে না
দেখেছি মানে ? আমি অমুক,
অমুক জায়গায় আপনার সঙ্গে আলাপ হয়
পরিচয় পেয়েও জ্বললো না তার
চোখের দুটি বাল্ব
ধীরে-ধীরে যেন নিবে এলো—
মনও বুঝি
দুঃখ হল আমার, তার কণ্ঠের চেয়ে বেশী
অযথা তার অসুবিধে করে
তবু বললুম—একটা কথা ছিল
তিনি বল্লেন—বলুন
আপনার চেহারাটা একটু ধার দেবেন
ধারণ করবো, মানুষ হবো।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ট্যাক্সিডার্মি

দরজা থেকে দাঁড়াই একটু সরে ;
বলি এসো, জুতো নিয়েই এসো
অনেক ধুলো সকাল থেকে জমেছে এই ঘরে
তুমি এলে বাড়বে না খুব বেশী, এসো।

ভোরেই একজন এসেছিল
অনেক কথা বলার পর ঐ চেয়ারে বসেছিল,
কিন্তু যখন উঠে গেল কিছুই রেখে গেল না সে,
আমিও কিছু শব্দ বলেছিলাম, কেন বললাম—কেবলি অভ্যাসে ?

অভ্যাসেই কি বেঁচে আছি ?
নিয়ম করে মুচকি হাসছি
এই হাসির কি মানে আছে
আমার কিংবা তোমার কিংবা পর্দাপ্রিয় দরজাটির কাছে।

দরজা আমার খোলাই
বাতাস এলে একটু সরে দাঁড়াই,
মানুষ এলেও তাই,
একটা ঘর আমার ঘর আমার দুঃখ সুখের দেয়াল……
জুতো নিয়েই ঘরে এসো, মৃত জন্তুর চামড়া ঢাকা পায়ে
ধুলোর দাগ লেগে থাকুক, শুধু দেখো চোখ উঠিয়ে
স্পষ্ট আরেক ট্যাক্সিডার্মি পাথর চোখ মৃত মহিষ
যার মৃত্যু অতি প্রাচীন
তবু কেন মানুষ দেখলেই
শক্ত হয়ে ওঠে তার ঐ কাঠবাঁধানো চোয়াল।

ব্রততী বিশ্বাস

স্বপ্নে মহোৎসব

এখনও ঘুম, স্বপ্নের ভেতরে হাঁটে সময় ও স্মৃতি
লেবুফুলের গন্ধ বীজনসদৃশ
অমল চোখের জল হৃৎপিণ্ডে ক্রমশ প্লাবিত
এখনও ঘুম, চোখের তারায় গড়ে ওঠে
ভেঙে যায় ময়দানবের প্রাসাদ
মন্ত্রোচ্চারণের মতো অলৌকিক স্তব্ধতা
জেগে থাকে বিস্মরণ অন্তর্বাহী নদী
পল্লবিত শিল্প গাঢ় অভিমান অন্তরের ঘ্রাণ
নিতে শিশির নিঃশব্দ হয়
বিস্তার জানে তার অবিচ্ছিন্ন সমতল বসন্তবাতাসে

গানের মায়াজাল শেষ ভ্রমণ খুঁড়ে আনে
অসুখী গহ্বর থেকে
ঘুমের ভেতরে পাখি ডাকে
স্বপ্নে মহোৎসব, হাঁটে সময় ও স্মৃতি।

অখিল দত্ত

আত্মচরিত

অরণ্য, তুমি আমার স্নেহ আমার ভালবাসা
চাঁদ, তুমি আমার শোভা আমার ঘরের ছায়া
ফুল, তুমি আমার স্বপ্ন আমার প্রতিজ্ঞা
ভালবাসা, তুমি আমার অহংকার আমার পূর্ণতা

শংকর মিত্র

আঠাশে আশ্বিন

কিছু শ্বেতপদ্ম, রক্তকরবীর গুচ্ছ দিয়ে যেতে পারো
ভালোবাসার গভীর উত্তাপ প্রাণের আনন্দ
কোলাহল বন্ধ রেখে রাজেশ্বরীর গান শোনাও
আমার স্বপ্ন নিয়ে আজ বেঁচে থাকি সর্বলোকে।
আজ যদি কিছু দেবার না থাকে,
মনে রেখো আমি আছি আজো।
সংকীর্ণ ভূমিতে আবদ্ধ জলা
রং নেই কোন, শুধু দুহাত বাড়িয়ে দেওয়া।
আখেরি বন্ধ রেখো আজকে,
পবিত্র গন্ধ ভরে দাও স্বপ্নলোকে।

পৃথিবীর বয়স বাড়ে আমার বাড়ে অকৃপণ হিসাবে
জানালা বয়ে ভেসে আসে সূর্যের আলো,
বয়ে যায় বয়ে যায় কালস্রোত—
তারই মাঝে আজ দিয়ে যাও
কিছু শ্বেতপদ্ম আর রক্তকরবীর গুচ্ছ।
হতে দাও আজ নির্মল স্ফটিক স্বচ্ছ।

প্রণব মাইতি

দুপুর তখন

দুপুর যখন একটা এবং আকাশে চিলের ঝাঁক
তখনই তোমাকে এবং সুধাকে
বুকে ভালোবাসা পাকে বিপাকে
কোন্ অলিখিত শব্দে মন্ত্রে হৃদয় করেছে ফাঁক

নিদাঘ দুপুরে পরিশ্রান্ত ছায়া তুলে নেয় পাদপপান্থ
রোদে ঘামে নেয়ে শুশ্রূষা চেয়ে
দরোজায় করাঘাত
বনস্পতির আদলে তোমাকে
ভালোবাসা ভেবে মনে পড়ে কাকে
নির্জনতার শরীরে ছোবল
একপাল দাঁড়কাক
তখনও দুপুর পরিশ্রান্ত আকাশের ছায়া ভ্রমণ ক্লান্ত
দুর্বিপাকের কথা শুনি তবু
চারদিকে রাখঢাক
তোমাকে বলার শব্দমন্ত্র
থিরথির কাঁপে হৃদয় যন্ত্র...
দুপুর তখন একটা এবং আকাশে চিলের ঝাঁক

বিচ্ছিন্ন পায়ের শব্দ

বিচ্ছিন্ন পায়ের শব্দ মুছে দিচ্ছে দিন
শিথিল দুঃখের হাত ঘরের ছায়ায়
তুলে ধরে বিষাদের নির্জন মহিমা ;
স্মৃতি চারণের গল্প সম্পর্ক-বিহীন
বড়ো বেমানান এই বর্ণমালায়
ওহে রঙ্গবিলাসী টেনে দিলে সীমা
সুখের সংবাদটুকু দিয়ে চলে যাও
আতিথেয় তুচ্ছ করে ভেঙ্গে ফেলো প্রথা
বিধিবদ্ধ জীবিকায় ইচ্ছারা উধাও
ভালো কথা উঠলে দ্যাখো বিশ্বাস হয়না—

জীবনের এই এক অদ্ভুত তিক্ততা.....
কেউ ছিঁড়ে ফেলে চুল কেউ ছোঁড়ে পা।

মেজবাহ খান

কবিতাগুচ্ছ

১. ঠাকুরের গানে আমার হৃদয়টা হয়ে যায়
পাখীর ডানার প্রেম, পাড়াগাঁর রোদ্দুর, আহা কী সবুজ!
আমার হাত দিয়ে পাঁচ চার তিন দু'একটা কার্তুজ
ছুঁড়ে আর দেবোনাকো মানুষের গায়।

২. মুঠোয় চেপে রেখে দিলাম মুগ্ধ হবার পাঠ,
ইচ্ছে করে পুড়িয়ে নিলাম তোম ছবিখান্।
ঘুম পাচ্ছে? বিছিয়ে দিলাম সোনার গড়া খাট
বুকেয় নিচে লুকিয়ে রাখি বাঁশের বাঁশীর গান।

৩. পাঁচ ইঞ্চি রক্তপাতে ভেসে গেলো স্বাধীনতা
মাটিকে আঁকড়ে ছিলাম
অতিরিক্ত রক্তপাতে সবকিছু ভেসে গেলো
তোমাকেই শুধু পেলাম।

রাতজাগা সুখ এখন আমার
নেইকো রক্তপাত
বুকের ভেতর খেলা করে তাই
প্রবল বৃষ্টিপাত।

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভোর আসছে

নদী মানেই ত' চলা।
যা চলছে এবং দু পাশের গাছ, পাথর আর পাখি
স্বপ্ন হ'য়ে উঠছে বুকে।
মাটির নীরস হতাশাকে ছাড়িয়ে
সবুজ হ'য়ে উঠছে ফসল ;
যা এগিয়ে চলেছে জন্ম দিতে দিতে পৃথিবীকে।

মাঝে মাঝে
তবুও যেন থামতে চায় এই সময়।
যখন ছায়ার মত দেখায় আকাশ,
কিছুই করবার থাকে না বলে।
শীতের কম্বল গায়ে জড়াই
যখন ঘুমিয়ে পড়তে থাকে শব্দ।

যা চলছে না,
এবং অনড় হ'য়ে আছে মনে

যা পাথর হ'য়ে হয় পাহাড়,
যা টানতে থাকে সামনের পথকে পেছনে—
সেই অন্ধকারকে আমি ছাড়াতে চাই।
ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়
জন্ম নিচ্ছে তবু শব্দ
আকাশ হ'য়ে উঠছে লাল
কারণ, আরেকবার ভোর আসছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শোক মিছিলে

তেমন আধোচাঁদ, আর আলো অন্ধকারে মুষড়োলো পৃথিবী,
যেন কবির মৃত্যুর পর দীর্ঘ শোকমিছিল,
সেই বর্ষার রাতে যখন কেউ সোহাগ জানানোর নেই,
যখন ফুলে-চন্দনে সুবাসিত কবির বোজা চোখ পরম তৃপ্তির মুখ,
তাতে মেঘ কেটে গিয়ে পঞ্চমীর চাঁদ
আর তেমন দীর্ঘমিছিলে
কেউ না গিয়ে পারেনি।
মানুষটা দারুণ সাদাসিধে ছিলো, কেমন অন্যমনস্ক,
তাকে সকলেই ভালবাসে,
সে-ও ভালোবাসে চিলতে রোদ্দুর, খরগোশ,
আর মানুষের জীবন, দুঃখবোধ,
আরও ভালোবাসে বাঁয়ে ল্যাম্পপোস্ট, ডাইনে জর্দার দোকান রেখে
একা একা হেঁটে চলে যেতে
(ঐ দোকানের জর্দা যে বড়ো প্রিয় তার)
একা রাত্রির শরীক হওয়াও তার অভিপ্রায় ছিলো
সে মানুষ নির্বিকার, সুখে না, দুঃখেও নয়, সে কোথাও টলে না
তাকে কি আর দূরে রাখা যায়,
বাঁয়ে ল্যাম্পপোস্ট, ডাইনে দোকান রেখে আরও দূর হেমন্তের পথে

সুশীল রায়

অমাবস্যা

তীব্র অনুরাগে
আমি অমাবস্যা নিয়ে খেলা করব, পক্ষকাল আগে
দুরূহ সংকল্প নিয়েছিলাম। অথচ
ঘুচে গেছে সে সংকল্প এবং সংকোচও।
আজ আমি অসহায়, বড় অসহায়—
আলোকে বিস্বাদ লাগে, লাগে কটু তিক্ত ও কষায়,
আমার সর্বাঙ্গ ভরে গিয়েছে জ্যোৎস্নায়।
অমাবস্যা-আকাশের সর্বত্র ছড়ানো ছিল অজস্র ইশারা,
একটি-একটি ক'রে তারা
গুনেছি সেদিন। তারা আকাশ পাহারা
দিয়েছিল। তারা নয়, তারা যেন তিল
আকাশের মুখে আঁকা সৌন্দর্যের উজ্জ্বল মিছিল
কিন্তু আজ চারিদিকে আলো আলো আলো—
যাবতীয় অন্ধকার কোথায় মিলালো।
মুছে গেছে তাই সব তিল,
তাই এত অন্ধকার সমস্ত নিখিল।
অবসন্ন এ সংসারে প্রসন্নতা কারা যেন আনে?
কে জানে, কে জানে!
তিল-তিল ক'রে তিলোত্তমা
একদা করেছে যারা জমা—
তারা অদ্বিতীয়
তারা প্রিয় তারা প্রিয়, তারাই জীবনে স্মরণীয়।

কৃষ্ণসাধন নন্দী

নির্বাসন

তোমার শ্মশান শয্যা তৈরী হচ্ছে কবি
নীল সাময়িয়ানার নীচে বিশ্রাম করো এবার
ভাঙা রেকর্ড বারবার বাজিয়ে তুমি ক্লান্ত
জীর্ণ শব্দে ছিনিমিনি খেলা খেলে
বরং স্তব্ধ থাকো কিছুকাল
স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়ে তুলতে
বিন্যাসে নতুনতরবোধ
ভাঙো গড়ো নিজেকে
এভাবে প্রস্তুত করো জমি
একদিন সচকিত উত্থানে ঋজু পায়ে হেঁটে যেও

না পারো, যেও না……

পিনাকী ঠাকুর

অলৌকিক শোকচিহ্নগুলি

ক্রমশঃ লুপ্ত হয় মানুষের অমলিন শোকচিহ্নগুলি
এক একটি জীবন আসে, চলে যায়, স্বাক্ষর থাকে তার
সময়ের তেজি দাসখতে,
কতদৃশ্য আছে হায় এইখানে হেমন্তমলিন আয়ত
তৎসহ তাৎক্ষণিক স্বত্তার ভিতরে
কতদৃশ্য আছে বলো সপ্রব রমণী?

ক্রমশঃ লুপ্ত হয় মানুষের গভীরতর শোকচিহ্নগুলি
সমস্ত সময় ফুলে অবশেষে স্মৃতির প্রতিমা
দৃশান্তর ঘটে ক্রমে সময়ের হলুদ নিয়মে
লুপ্ত হয় শোকচিহ্নগুলি, শোকচিহ্ন লুপ্ত হয়
অথবা নিহিত থাকে দৃশ্য থেকে ক্রমশঃ বিমূর্ত দৃশ্যের ভিতরে…

পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত

জানালাটা খুলেই দিলেই—দরোজাটা খুলেই দিলেই

জানালাটা খুলে দিলেই—
ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাইরের আলো ও বাতাস ;—
আর সে আলো-বাতাসের উজ্জ্বল উচ্ছল ললিত স্পর্শে
হয়ে উঠি আমি একেবারে সজীব—সবুজ—সতেজ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই—
চোখে পড়ে অবনীর অভিনব অনুপম সৌন্দর্য—
—দেখতে পাই আকাশের অপরূপ অনবদ্য ঔদার্য ;—
আর সে সৌন্দর্য-ঔদার্যের সুন্দর মধুর অমৃত ছোঁয়ায়
হয়ে উঠি আমি একান্তই আনন্দিত—উল্লসিত—উদ্বেলিত।

দরোজাটা খুলে দিলেই—
একেবারে —একান্তই অবারিত হয়ে যায় বাহির—দূর সুদূর ;—
তারা এসে দাঁড়ায় আমার একান্ত সন্নিধানে ;—
আর তাদের সে সুমহান সুমধুর সুপবিত্র সান্নিধ্যে
থাকতে থাকতে—থাকতে থাকতে—একসময় আচম্বিতে
সন্ধান লাভ করি আমি অরূপের—অপরূপের—অমৃতের।

বিপ্লব চন্দ

চেনা মুখ

অবিকল চেনা মুখ দেখি পথে যেতে যেতে, সে যেমন
শান্ত ছিল ধীর চলা ফেরা ;
চোখের আড়ালে ছিল কৌতূহল
চঞ্চুপট চতুরতা।

আশ্চর্য ব্যবহারে দেখি হুবহু মিল !
ভুল কি আমারই হ'লো ; নাকি মনের বিভ্রম

যেমনটি জড়ানো ছিল জাফরণ শাড়ী, সবুজ ব্লা—
কিংবা বাজুতে রয়েছে তাঁর মায়ের তাবিজ।
কোথাও অমিল নেই ; তবু বার বার মনে হ'তে থাকে
সেতো রয়েছে অন্যত্র বরফের দেশে।
এখানে কিভাবে সম্ভব—সেতো চলে গেছে বহুকাল আগে
মুখোমুখি হবে না আর ; এই ছিল কথা, তবু একি হায়—
কে তুমি ! আমার মনের ভুলে অবিকল আসে
হঠাৎ চমক ভাঙে দেখি খুব হৃদয় আবেগে
কোথায় সে আলোর রশ্মি
ভ্রান্তি কি আমারই হবে দীর্ঘদিন দেখিনা বলে !

কৃষ্ণ ধর

কবির জন্য ইতিহাস লেখা হচ্ছে

শোনো কবির মৃত্যু হলে তার কেমন দুঃখ হয়
তা সে বলে বোঝাতে পারে না
সুকান্তর জন্য এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়
আর ঘুমুতে পারে না বাকি রাত।

ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে নজরুল ইসলামকে
ওরা শুইয়ে রেখেছে
তাঁর কবরের মাটিতে কি কোনোদিন হাত দিয়ে
সে বলতে পারবে, কবি আমি এসেছি
তোমার শেষ শয্যার পাশে।

কেন ওই জ্যোৎস্নাভাঙা রাতে কেবলি
অলৌকিক শিল্পের কথা মনে হয় তার ?
মাইকেলেঞ্জেলো কি এখনও পাথর কেটে
বানাচ্ছেন রমণীয় পূজার শরীর ?
কবি ও শিল্পীর জন্য তার ডায়েরিতে

অনেক পাতা খালি রাখা আছে
সেই সব শাদা পাতা একদিন সারারাত জেগে
সে কালির অক্ষর দিয়ে ভরে দেবে।

কবির জন্য ইতিহাস লেখা শেখা হচ্ছে অনবরত
সেখানে প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত
জেগে থাকবে শুধু ট্র্যাজিডির মহিমা।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবগাহন

বেদানার মত দানা দানা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে মেঘ
তবু কেন তুমি ভয় দেখাও
তোমার চোখের শাসনে
তুমি তোমার প্রতিবাদের নিষ্ক্রমণ প্রপাতে
ডোবাও তোমার শরীর
মৌল প্রার্থনার মতো ফিরিয়ে নাও
তোমার প্রার্থিত আঁচল
কঠিন শব্দহীনতায় অকারণ তুমি সাহসী হয়ে ওঠো
নিবিড় দুঃখের নামে মগ্নমুখর হিমানীপতন
ঝড়ে ওড়ে পাতা এবং এক ফুঁয়ে নিভে যায়
সম্ভোগের দ্যুতি

প্রদীপ রায়চৌধুরী

দুঃখের নাগালে

মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়—
দর্শকের নির্দিষ্ট আসনে যে আমি
শিল্পীর তুলিতে আঁকা উৎগ্রীব মঞ্চের খেলায়
রাজ্য ছেড়ে চলে যাই দূরে

সামনেই কুরূপা চিত্রাঙ্গদা হাতের মুদ্রায়
ভিক্ষা চায় বিলোল কটাক্ষ
শরীরের প্রতিকোষ তার গর্ভবতী হতে চায় নিটোল সৌন্দর্যে
ঠিক এই অবসরে আল নিঃসাড়ে
আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দ্বিতীয় আমি
দুপাশের স্থান কাল পাত্র থেকে
সরে আসি দূরে
ডাকঘরের শিলমোহরের মতো
অস্পষ্ট কোন মুখ মনে পড়ে
মঞ্চের নক্সায় প্রগলভ কৌণিক আলো
হেসে ওঠে কিশোরীর মতো
অথচ আমার জাদুকরের করোটির মায়ায়
সাদা জ্যোৎস্নায় ঢেকে যায় চোখ
এবং ততক্ষণে স্মৃতির সেতুর উপর
পা রেখে দাঁড়ায় নিজস্ব ছায়া
হানা দেয় তৃষ্ণার তমসায় লুব্ধ বাজপাখি
আমি থাকি ফেলে আসা দুঃখের নাগালে

নির্মল বসাক

ছড়িয়ে দিয়েছে ডানা

ছড়িয়ে দিয়েছে ডানা রৌদ্রের ভিতর বাতাসের ভারে
পাখি যায় দিগন্তের সীমানা ছাড়িয়ে দিনান্তের শেষে যায় উড়ে
কেন যায় সীমা থেকে সীমাতীতে নিঃসীম চরাচর কাঁপে
গ্রাহক কম্পন যন্ত্রে ধরা পড়ে সে আবেগ কেন ধরা পড়ে
প্রতিদান সে কী দিতে পারে সে কী চায় ফিরে পেতে কিছু
হৃদয় রক্তাক্ত করে প্যাখি কী পেয়েছে প্রত্যাখ্যান
সঙ্গীহীন এক বিন্দু অশ্রু তার থেকে গেল নিহিত সম্পদে

রূপের নিগড় ছিঁড়ে যেন বাতাবহ জীবনের ধ্বনি চিন্তার্পিত
নায়িকার মতো

তাপস ওঝা

কতকগুলো দিন

এখন আবার আমার ইচ্ছে হয়
সুচরিতের হাতে হাত রেখে
রুক্মিণী মন্দিরে
মায়েদের ব্রতকথা শুনি।

আগের দিনের সন্ধ্যেবেলায় গোবর নিকানো
জ্যামিতিক বৃত্তের মাঝে বসে বছরের কোন দিনটায়
মা, তুমি অন্য সব মায়েদের সাথে রুক্মিণী মন্দিরে
ব্রতকথা পড় ?

বছরের কোন কোন দিনগুলোতে তুমি আমার ভায়েদের
হাতে বেঁধে দাও হলুদ রাঙানো একফালি সুতো ?
—আর, প্রায়ই যা ঘটে থাকে তোমার নিরম্বু উপবাস
যার জন্যে পরদিন বাঁধাধরা অসুস্থতা তোমার—
কবে কবে সেইসব দিনগুলো ?

আমার রঙীন ক্যালেণ্ডারটায় তুমি তোমার বহু ব্যবহৃত
দুর্বল আঙুল দিয়ে যে আঙুলের আলপনায় আমাদের
ঘরের সমস্ত উৎসব শিল্পময় হয়ে যায়, সেই আঙুল দিয়ে
পিটুলী-গোলায় চিহ্নিত করে দাও।

আমি ঐ সমস্ত দিনগুলোতে কিছুক্ষণ একা একা থাকব।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

খোলা মুঠি

পায়ের পাতায় ঝরে পড়লো একটি টগর ফুল
ফুল ঝরলো, একটি বোঁটা বিঁধে রইলো আমূল।
বিঁধে রইলো, বিঁধে আছে, বিঁধে থাকবে জানি,
ঘুমের মধ্যে কে যে বললো 'বাবু একটু পানী',

তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি এপার ওপার বন
কয়েক কোটি খোলামুঠি একটি উপবন
কিছু আঁচল, উড়ন্ত চুল, ঈর্ষা ভেজা চোখ,
পাঁপড়ি খুলে তাকিয়ে দেখি একটি বালক-শোক
চোখ খুললো, দাঁড়িয়ে উঠলো, বললো 'একটু পানী'
এগারো বছর খুঁজে যাচ্ছি—'বাবু একটু পানী'।

শিশির গুহ

ঝর্ণাতলায়

বুকের ভেতর উথাল পাথাল
আগুন শুধু কৃষ্ণচূড়ার রক্ত ঝোরা
বনস্পতি নীলচে বরণ
তোমার শোকে স্মৃতির ভারে
স্বপ্নে তুমি উদার আকাশ
খুশীর কুসুম, সম্মুখে তা
বেদনভরা ।।

অনেক পথের শেষ পাথারে
বিহঙ্গদের কূজন শাখে
ক'জন গেল—এলো ক'জন
কেইবা বল খবর রাখে,
শুধু তুমি—কেবল তুমি
ছড়িয়ে হাসি ঝর্ণাতলায়
বাঁচার কথা শোনাও খানিক
বুকে দিয়ে ফুলের সুবাস ।।

রণজিৎ দেব

পদ্মের নাল জড়িয়ে সাপের ফণা

যাবো যাবো বলছো, যাবার মতো কিছু নেই
কিংবা ফিরে আসবো ভাবছো, ফিরে আসার মতো কিছু নেই
পদ্মফুলের নাল জড়িয়ে সাপের ফণা উঠেছে দোলে

পাতার উপর জলের বিন্দু টল টল করছে
আজও সূর্য উঠেনি আঁধারও আসেনি ফিরে
আমি হাঁটবো কি করে ?

মাথায় গোঁজার জন্যে যে পালক তুলেছিলে হাতে
সেই পালকের জন্যে ময়ূরীর পেখম আজও মেলায়নি
মেঘ জমে জমে পাথর হয়েছে
আকাশ ফেটে কোনদিন বৃষ্টি আসবে না
কিংবা মেঘও যাবে না ফিরে
ভালবাসবো কি করে ?

ভোলা যাবে না সেই সময়
তোমার বুকের উপর মৌচাক গড়েছিলো
তিনবার টোকা দিয়েছিলে দরোজায়
পুরণো পর্দায় রিনি রিনি কাঁপন
নিবিড়তায় পাবো কি করে ?

যাবার মতো কিছু নেই, ফিরে আসার মতো কিছু নেই
পদ্মের নাল জড়িয়ে সাপের ফণা

রঞ্জন বিশ্বাস

অশ্বমেধের ঘোড়া

নিষিদ্ধ আনন্দের বেহিসেবী উল্লাসে
জনকয়েক অর্বাচীন
শৌখিন হাতে ল্যাসো ছুঁড়ে
বন্দী করেছে অশ্বমেধের ঘোড়া।
অসঙ্কোচ কৌতূহলে কেড়ে নিয়েছে
তার ললাটের জয়পত্র।

নিষেধ বিধির প্রতারিত প্রান্তরে
উদ্ধত হ্রেষায় খুর ঠুকছে যুবনাশ্ব
স্ফুরিত হচ্ছে বিদ্যুৎ
থরো থরো কাঁপছে পৃথিবী।

অন্যদিকে যজ্ঞভূমির সমিধ ঘিরে
সূর্যগ্রহণের অন্ধকারে
শঙ্কিত প্রতীক্ষায় জাগর—
নিঃসঙ্গ ঋতিক আর অগ্নিহোত্রীর দল।

অপরাজিতা গোপ্পী

যে দৃষ্টি বিভ্রান্ত

চারিদিকে সমুদ্র কোলাহল।
অবরুদ্ধ চেতনা,
অবচেতনের লৌহ আবেষ্টনী ভেঙ্গে
প্রত্যাসন্ন মুক্তির আবির্ভাবে
প্রকম্পিত।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার।
কারাগারের লৌহদ্বার বার বার
দৃষ্টি বিভ্রান্ত ঃ
আলো হ'তে বঞ্চিত উত্তরণের পথ,
অন্ধকারে
দ্বারে দ্বারে হাঁক দিয়ে ফেরে
প্রত্যাশিত আলোর সন্ধানে।

বন্দীর শৃঙ্খলিত পদধ্বনি
কারাপ্রাচীরের আবেষ্টনী ভেদ করে
ছড়িয়ে পড়ে, দূরাগত আকাশে।
সহরে গ্রামে দুর্বল দ্বিধাগ্রস্থ
মনের মিনার ঘিরে,
একটানা শৃঙ্খল ধ্বনি—
'আর নয়—আর নয়—আর নয়।'
আর্তনাদে
প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফেরে।

আকাশে যাতাসে সে ধ্বনি
অনুচ্চারিত দ্বিধায় যেন বলে
'ওগো অন্ধ বধির অদৃষ্টবাদীর দল,
কে কোথায় অন্ধ গুহায় এখনো
রয়েছো নিদ্রামগ্ন—ওঠো জাগো,
চেয়ে দেখ—দ্বারে প্রত্যাশিত
আবির্ভাব।'
এই বেলা হাতে হাতে তুলে নাও মশাল,
প্রজ্বলিত মশাল—দুর্গম কণ্টকিত গিরিপথ
অতিক্রম ক'রে,
প্রসারিত কর উদীপ্ত মশাল,
ছড়িয়ে দাও আলোর বন্যা,
সমুদ্র উদ্বেলিত ঘন
অন্ধকারের বুকে।

রুচিরা শ্যাম

যেতে যেতে

কোন্ পথে বাড়ি তার ? বৃষ্টি ও মেঘের ঘোর স্বচ্ছ কাঁচে মায়াবী পুকুর
ঘুমের ভেতরে যেন চেনা পথ নীল নদী ফাঁকা মাঠ শেষ ক্ষেতে খড়
কিছুই অচেনা নয় বাড়ি ঘর মাঠে যার ছায়ারাগে নমিত ইসারা।

ঘুমের ভেতরে তবু বড়ো দেরি হয়ে যায় যেতে যেতে বিনষ্ট বাগান
চোরকাঁটা নষ্ট নীড় ছেঁড়া পালকের ফুল চোরাবালি মজাবিল আর
যেতে যেতে দূরে যায় ছবির মতন বাড়ি দেবতার মতো তার হাত।

মনে মনে শুধু বাড়ে আয়তির চিহ্ন আমি বক্ষ নই, লতা নই, নারী
সব নারী নদী নয়, কেউ ঝিল দিঘি কেউ, চারিধারে অটুট সীমানা
যদি নদী তবে কেন পায়ে পায়ে ঘোরে প্রীতি মায়া আর্ত পিছুটান

উপমা সরল নয়, তার অলঙ্কার শুধু অভিমান তোমার গরিমা
তুমি তো সহজ নও, আত্মপরিচয় তাই এতোই জটিল কুহেলিকা
পাথপাদপের জল তাই খুঁজে চলো আজো নারী তুমি কার কনীনিকা।

কমল তরফদার

পা

ঘাঘরা ঘুরতে থাকলে পা
তাজমহলের পাথর এমন মোলায়েম
নর্তকীর পা
উরুর কাছে মৃত্যুর এক ধরণের গন্ধ
কবর
তার ভ্যাপসা গন্ধ
নর্তকীর পা
যমুনার জল উঁচুনীচু মোলায়েম
পুলিনে বহু মৃত্যু বহু প্রেম
সকলের পা।
হাওয়া গোল হয়ে ঘোরে
শিউলির বোঁটা টিপে ধরে দুই আঙুলে
শ্যাম
নীল আঙুল মোলায়েম
দিগ্বিজয়ী পা ধূলিলিপ্ত নাচের শ্রান্তিতে
শরীরকে ছেঁকে ধরে ধুলো
ধুলোতে মৃত্যুর চেতনা

মোহন মিত্র

দিনের মতন যেতে পারি

মনুমেন্টের গা বেয়ে বেয়ে
রোদ তার উঠেছে মাথায়
পশ্চিমের কোন এক অজ গ্রামে সূর্য অস্ত যায়।
কোলকাতার ময়দানে এখন আকাশের ছায়া পড়ে।
ঘাসের শরীর থেকে গাছের শরীর থেকে
অন্ধকার ট্যামনার মতন লোভী চোখে তার মুখ বার করে।
আর মুহূর্তে কয়েক বাদে আশপাশের সব কিছু

কালো হয়ে যাবে
আলোর অভাবে।
একটা দিন কি সুন্দর ফুলবাবুটি বেশে
সেই কখন সকালে এসে
শহরের রাস্তায় দাঁড়ালো ;
তারপর বিকেল অব্দি
হৃদয় উজাড় করে ঘরে ঘরে—সব ঘরে
রাশি রাশি সোনার মোহর সে ছড়ালো।
এবার এখন তার যাওয়ার সময়
হয়।
এখন সে সবাইকে কুর্নিশ করতে করতে
চলে যাচ্ছে যাওয়ার নিয়মে।
তার রাঙা মুখ
যেন মুখে ফুটে ওঠে প্রণয়ের সুখ।
হে ঈশ্বর আমায় এমন শক্তি দাও
লোভ মোহ ঈর্ষা দ্বেষ কামুক স্বভাব পরিহরি
আমি যেন সোনার মোহর ছড়িয়ে অমন দিনের মতন যেতে পারি।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

আরো কতটুকু নেবে

সবটুকু দিয়েছি
আরো কতটুকু নেবে ?
তৃষ্ণার্ত মুখের কাছে অজস্র ফোয়ারা
মেঘ-মল্লারে বেঁধেছি এই বুক
পিপাসা তবুও মেটেনি ?
শরীর ছুঁয়ে বৃষ্টির কাতরতা !

আকাশে হু হু বাতাস, ঝড় উঠেছে কোথাও
বুকের মধ্যে ঝড়, খামখেয়ালী বিষণ্ণতার হাওয়া
এই জন্মে সবটুকু দিয়েছি
আরো কতটুকু নেবে ?

বেণু সরকার

এই বয়েস

রাঙাদির বুকের ওপর ঘুমোনোর বয়েস তখন
গাঁদাফুল ভর্তি পুরো একটা গাছ
শেকড়সমেত তুলে নিয়ে
ঘরের মধ্যে কার্তিকের অন্ধকারে
লুকিয়ে রেখেছিলুম।
তখন কি চোর ছিলুম আমি ?
নাকি বেলাবেলি বুড়ো হয়ে গেছি ?
শরীরের কোথাও কি ঝলমল করে মা,
ওবরার কার্পেট ?
লণ্ঠন জেবলে
এখনো পুরোপুরি তদারক চলে এ সবের,
তবু টিফিন সেরে অফিস যাবার বদলে
কোমর সমান উঁচু তাকিয়ায়
তোমার ওপর জুড়িয়ে যাই অক্লেশে।

মুকুল গুহ

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

১
সারারাত ধ'রে বৃষ্টি পড়লে মাঠ থেকে তারা
সন্ধ্যায়ই কেবল ফিরতে পারে
দাওয়ায় মাদুরে গোল হ'য়ে ব'সে রাত হয়
তাজা মাছের আঁশটে গন্ধ ধানসিদ্ধের গন্ধে
টালমাটাল সেই নারী
অবিরত গৃহকাজে ব্যস্ত থাকে।
২
খরা এলাকায় বৃষ্টি নামলে আজ
প্রথম ভোর হয়

চাগাড়ীর বেড়া বেয়ে উঠে আসে
কয়েকটি শুঁয়োপোকা,
খরা এলাকায় বৃষ্টি নামলে আজ
প্রথম ভোর হয়
ক্ষেতে ক্ষেতে বীজ প্রোথিত হতে থাকে
ব্যবহার সহজ হয়ে আসে।

সমরেন্দ্র দাস

দিন—আগামী দিন

ভোর হয়, লাফ মারে সূর্যদেব, শিয়রে দাঁড়ায়
আর আমাদের গোল রুটির দিকে যাত্রা হয় শুরু
থাবা হয় বড়, গ্যাস বেলুনের মত উড়ে যায় মেঘ-বুক পানে
আমাদের প্রিয় মানুষ অপ্রিয় হয়, অপ্রিয় ঘাড়ে রাখে হাত
মানুষের সমাজ, মানুষেরই রক্ত-মাংস চাটে ও চিবোয়
দূর থেকে কেউ কেউ হাততালি ছোঁড়ে—বহুৎ আচ্ছা, ফির দিখাউঁ
দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় আমাদের কাপুরুষ মন…
আবার সহসা, যেন সরে গেলে জল, পড়ে থাকে পলি—কাদা
আমাদের সামনেও আর একটি দিন পড়ে থাকে, দিব্য অবিকল
আহা, ঠিক তারই মতন দিন—আগামী দিন!

স্বপন মজুমদার

সমকাল

ইদানিং দুঃখ সংগী ব্যথার নূপুর
পায়ে দিয়ে গান গাই নাকি চিৎকার
আত্মঘাতী হলেও দেখি স্মৃতি জ্যোৎস্নার
খুঁজি শুধু কোথায় পাবো হারানো মিষ্টি সুর।

মন্দিরে বিশ্রাম নিই—যাবো, অতঃপর
অকস্মাৎ চতুর্দিকে একি অট্টহাসি
মুহূর্তে প্রত্যাশা ভঙ্গ ; আমি ভালোবাসি
তলোয়ার পাশে উন্মাদ, কোথায় ঈশ্বর।

মারা যায় এইভাবে ভীরু, তার জের
প্রজাপতি ভালোবাসা ফুলের বাগানে
চাবুকের দাগ পিঠে কি খোঁজে নির্জনে
উলঙ্গ ভালোবাসা—ডাক দেয় শুধু বসন্তের।

রতন বিশ্বাস

হোলঙ্ একটি নদীর নাম

মাদারিহাট হাসিমারার
মধ্যিখানে—
এই সেই হোলঙ্
পাথর সরিয়ে বিশুষ্ক বালুকণায় অন্ত স্বাধীন।
অরণ্যের অন্ধকারে হিমেল
জলরেখা
সারাটি বছর পাইথনের মত সরে যাওয়া।
জলাধারের উপর সেতু ঃ
সোঁ সোঁ রেলগাড়ি—
যেন টগ্‌বগ্ ঘোড়া।
হরিণী জল ভেঙে ওপার থেকে
এপারে এলে,
কিংবা
কোন নারীর জল ভেঙে
শিশু ভূমিষ্ঠ হলে,
হোলঙ্ নদীটি
বাবলা, বুনো ঝাউ, পলাশ,
কাঁটা ঝাড় ময় ময় শব্দে শব্দে কলকল।
কোথা থেকে আসে সব
কোথায় দুঃখের রেখায় আত্মশীল
হোলঙ্ হোলঙ্।

সৌমোন বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কী ভীষণ বর্ষা এখন

বর্ষায় মেঘের শরীর বেড়ে গেলে
ঘুলঘুলিতে ঘরের দেয়ালে আনাচে-কানাচে
অন্ধকার ঝুলে থাকে মাকড়শার জালের মতন
অহংকারী নর্দমার লোমশ হাতে নষ্ট হয়ে যায় বারান্দার সুখী স্বভাব।
এখন, কী ভীষণ বর্ষা এখন!

বৃষ্টিতে ভয়েলশাড়ী নষ্ট হবে বলে
মিঠুরা আসে না নির্দিষ্ট জায়গায়
মাঝরাতে বাজের শব্দে শরীরে লোম বেড়ে গেলে
ভয় লাগে নিজেকে নিজেই নিজের গোপন গভীর ক্ষতে
নখ ঢুকিয়ে আঁচড়ে দিই
নিজেকে রক্তাক্ত করে মিঠুদের দেয়া ফটোতে মুখ ঘসি।
এখন, কী ভীষণ বর্ষা এখন!

রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম মৃত্তিকার ঘরে কড়িকাঠ ছুঁয়ে

বুকের ভিতরে তার আহামরি প্রেম জেগে থাকে,
অনির্বচনীয় প্রেম—নষ্ট বৃক্ষে ফল হয়ে
ঝুলে থাকে যাবৎ জীবন;

যাবৎ জীবন প্রেম—নাকি অন্য কিছু বিধৃতে প্রমাদ!

স্মৃতিভরে ঝুলে থাকে বেসাতি লেবুর গন্ধ,
তুলকালাম বৃষ্টির ভিতরে সন্ধ্যার সর্বাঙ্গ জুড়ে
লেপ্টে যায় বেশ্যা আর রবীন্দ্র সংগীত আর রাম,
তুমুল জাঁকিয়ে বসে সাট্টার দালাল কিম্বা রাজা পকেটমার

আমার দু হাত জোড়া এই জন্ম মৃত্তিকার ঘ্রাণ পাল্টে যায়।

আশৈশব রক্তবহ নালিকার ঘ্রাণ হতে ক্রমাগত দূরে অপসারী
ব্যক্তিগত জীবন থেকে ব্যক্তিগত এই সরে আসা—
এভাবে জীবন চলে এইখানে;
সমস্ত দূরের রুটে টুকরো-শাটল হয়ে যায়; ক্রমাগত
অদল বদল চলে অদল বদল চলে অদল বদল.....

নিজস্ব দুহাত ভরে একদিন ভেসে ওঠে একাধিক মৃতের মিছিল।

উজ্জ্বল সিংহ

আহ্বান সঙ্গীত

সে সময় আহ্বান সঙ্গীত বাজে দ্রিমিদ্রিমি। পৃথিবীর নাম ভুলে যাই।
রেললাইনের ধারে পথ, পথে পথে কীটদষ্ট ফুলের বাগান। চলমান
দুঃখ এসে রুমাল ওড়াতে ওড়াতে বলে, আর দ্যাখা হবে না।
তোমার যুবতী, তেইশ বছরের বসন্ত সমৃদ্ধ যৌবন, অপাপবিদ্ধ মহার্ঘ
বুক, এসব আমাকে দাও। আমি ধনী হবো, কৃপণের মতো
জমাবো না ধন। সমস্ত সঞ্চয় লণ্ডভণ্ড করে আমি দস্যু হবো।
তোমাকে লুণ্ঠন করে যাবো প্রতিরাত। নিজস্ব সম্পদ লুণ্ঠনে
প্রকৃত আনন্দ পাবো আমি। তাতে কোনো পাপ নাই।

সে সময় আহ্বান সঙ্গীত বাজে দ্রিমিদ্রিমি। ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথিবীর
নাম ভুলে যাই। একটি নদীর নাম ভালোবাসা, একটি বাগানের
নাম ভালোবাসা, একটি সুরভিত পাহাড়ের নাম ভালোবাসা,
একটি সুতীক্ষ্ণ কাঁটার নাম ভালোবাসা। রেললাইনের পথ
ধরে ধরে কীটদষ্ট ফুলে সে করে বসতি। কীটগুলি মরে
যায়, মৃত্যুকে মহান্ বলে জানে। মৃত্যুতে পাপ নাই।

সে সময় আহ্বান সঙ্গীত বাজে দ্রিমিদ্রিমি। তুমি রুমাল
কোমরে রাখো গুঁজে। ফের দ্যাখা হবে। আমি সেদিন
লাল গোলাপকোরক ছিঁড়ে খাবো। তোমার তেইশ বছর
বয়স আমাকে দাও। তাতে কোনো পাপ নাই।

আশিস শিবনাথ

সে একজন

সবাই যখন সকাল সন্ধ্যা নিয়মমাফিক কাজে
ব্যস্ত থাকে ব্যস্ত থাকার সাজে
তখন তুমি বাজের মতো হঠাৎ আকাশ চিরে
সব হাহাকার তুচ্ছ করে কুঁড়ি কুসুম ছেঁড়ো।

এরই মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ ভালোবাসায় গড়া
দাম্ভিকতা বাচালতা হাসিকান্নার ধরা
বন্ধকী সব—তোমার হেফাজতে
মরণ বাচন যখন তখন অঙ্গুলি সংকেতে।

অমিয় সরস্বতী

প্রত্যয়

মঞ্চ শিল্পী
রামধনু আলো
অসংলগ্ন সংলাপ
প্রজ্ঞা পারমিতা
বিধবস্ত বসন্ত
বিবর্ণ ব্যথা
অসবর্ণ উত্তরকাল
পরিচয় মায়াজাল
জিজ্ঞাসার জিঘাংসায়
শুধু
বিবৃত
সত্য
জীবনের কঠিন প্রত্যয়।

কমল চট্টোপাধ্যায়

মনের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে

আগুনে ছুঁয়ে শপথ করলি
তুই আমার সঙ্গী হবি
সব জ্বালা জুড়িয়ে নাকি
নতুন প্রভাত এনে দিবি ?

কাব্যগাঁথা গল্পকথা এমনি কত
চিন্তাবোঝামনকে নিয়ে
জনে জনে দেখিয়ে দিবি
হাসনুহানার দিব্যি দিয়ে !
জীবন সিঁড়ি বেয়ে এমন অনেক দূরে
হিমঘরে নয় শক্ত মাটির আস্তানাতে
তোর শপথের সমাধিতে লিখছি যে তাই
মনের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে
আর ক'জন করবিরে ছাই।

কবিরুল ইসলাম

ফেরা

আমার ছেলের সঙ্গে বাজি লড়ে
আমি হেরে যাই,
আমার মেয়ের সঙ্গে আড়ি করে
আমি ভাব চাই।

আমি দৌড়ে হাস্যে অমৃতে ভাষণে
আমার শৈশব ফিরে পাই ;
আমার বাবা মা যেন পুনরাগমনে
আমি জিতে যাই ।।

মহেন্দ্রপ্রসাদ সাহা

শুধু একটিবার

একটিবার শুধু একা থেকো
জানা-অজানায়, চিরন্তন প্রেমে
কবে কোন্ শূন্যতায় একক আনন্দে
পূর্ণতায় পাবে নীলকণ্ঠের আলিঙ্গন

নিলীমার নীলে-নীলে
বাজে অসমাপ্ত ভৈরবী
জাগে বন্ধুর বুকে
প্রেমের ক্লান্তি,
নরম চোখের ভালবাসা।
তারপর, বেজে যায়
সুদূর নিলীমায়। আশ্চর্য ভালবাসা
শুধু একবার,
একটিবার আজ একা থেকো
আমার অজানায়।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বাসের তেজি ঘোড়া

বুকের গোপন রক্তে নির্জন হ্রদের কাছে
ভালবাসা স্মৃতির পলাশ ফুলে দাউ দাউ জ্বলে ;
ফুটে উঠে দেড় লক্ষ গুলমোহর মেহগনী দুরন্ত হাওয়ায়
হীরে-পান্না-চুনি ঝলকে কার কর স্পর্শে ?
ডাহুক সোল্লাসে ডাকে রুক্ষ বুকে বৃষ্টিপাত হবে।

শপথের পতাকায় দারুণ বিশ্বাস মাখা
ভালবাসা যুদ্ধ জয়ে যাবো,
নতুন মানচিত্র হাসছে লাল নীল বেগুনি রঙের
বিশ্বাসের তেজি ঘোড়া কেশর দুলিয়ে ছুটছে বেপরোয়া
ঘুরে ঘুরে গৈরিক ধুলো উঠছে দিগন্ত রাঙিয়ে…
পিয়ানো বাজানো রাত্রি, বসন্তের রূপালী নিশীথ
বুকে তার দুর্গে বাড়ি রহস্যের বিচিত্র প্রতিমা
সেই দুর্গে রাজকন্যা বহু যুগ নিঃসঙ্গ তাপসী
আমি তাকে মুক্তি দেব, অনির্বাণ ভালবাসা লুঠ করবো
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে ছুটছে অন্তর্লীন বিশ্বাসের তেজি ঘোড়া
বেপরোয়া শাসন মানে না।

ভয়

অভ্যাস বশে অনেক অভাবেই অভ্যস্ত হই
অভাবের তাড়নায় ভুলে যাই স্বভাব,
যেমন ভুলে গেছি ইলিশের স্বাদ
ভুলে গেছি খাঁটি ঘি'-এর গন্ধ,
নিত্য নিজের পিণ্ড গ্রহণে
প্রতিবাদ করে না উদর।
শরীর, মন এবং বিবিধ কাজ সব চলে ঠিকঠাক।
অথচ প্রশস্ত রাজপথে দীর্ঘ মিছিলের অনুপস্থিতি
মনকে নাড়া দেয়
মিটিংহীন ময়দানে বাতাস ভারী মনে হয়
নিশ্বাস নিতে বুক কাঁপে
মৃত্যু ভয়হীন মনেও ভয় জমে
আশা এবং বিশ্বাস হারিয়ে যাবার।

অম্বরায় সরস্বতী

সময়

কিছু কিছু সময় আসে মনের অসুখ বাড়ায়
মধ্যরাতে বিষের বাঁশী বাজায়
স্বপ্নগুলো দিনদুপুরে আলসামিতে গড়ায়
মুহুর্মুহু দ্বন্দ্বগুলো যখন তখন বেসামাল
কিছু কিছু সময় আসে মনের অসুখ বাড়ায়
সকালসাঁঝের ভাবনাগুলো হাওয়ার সাথে
হাত মিলায়
এই সময়গুলো বিষম বেজায় মন্দ
স্বপ্নগুলো আকাশ বাতাস উথাল মাতাল
এমনিভাবেই তোমার আমার ভালোবাসায়
দ্বন্দ্ব আনে কিম্বা মনের অসুখ বাড়ায়।

দুটি বিদেশী কবিতা ঃ

আলবানিয়া

মিগজেনি

কলঙ্কগাথা

কোন এক পাণ্ডুর সন্ন্যাসিনী, আরও অনেকের পাপের সংগে
আমার পাপগুলি ও যে তার শ্রান্ত কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়,
মোমের মতো কাঁধে তার, কোন এক দেবতার চুম্বন নিয়ে
আমার সম্মুখ দিয়ে পলায়ন পরা দেবদূতীর মতোই চলে গেল।

পাণ্ডুর এক সন্ন্যাসিনী, সমাধি প্রস্তরের মতোই যে শীতল,
ভস্মীভূত আকাঙ্ক্ষার মতো ধূসর চোখে
রক্তাভ পাতলা ওষ্ঠাধরে—যেন একজোড়া ফিতে দিতে তার
কান্নাকে বেঁধেছিল,
আমার স্মৃতিতে তার ভৌতিক ছাপ ফেলে চলে গেল।
প্রার্থনা থেকে সে উঠে আসে এবং প্রার্থনাতেই সে ফিরে যায়
তার চোখে, তার ঠোঁটে। আঙুলে, ঘুমন্ত প্রার্থনাগুলি
তারই প্রার্থনা ছাড়া কে জানে কেমন হয়ে যেতো
পৃথিবীটা
কিন্তু তবুও, প্রার্থনা তার পৃথিবীকে বাঁচাতে পারেনি।
পাণ্ডুর সন্ন্যাসিনী! সাধুদের প্রেমে শিখার মতোই
বেদীর ওপরে
তাদের সম্মুখে আনন্দে নিজেকে দহন করো, উন্মোচিত করো,
ঈর্ষা করি আমি সেইসব সাধুদের
আমার জন্যে প্রার্থনা করো না তুমি নরকের ভেতর দিয়েই আমি
সাঁতরে যেতে চাই।

আমি এবং তুমি হে সন্ন্যাসিনী, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের
আকর্ষণের মাঝামাঝি একই দড়ির দুটি প্রান্ত
দ্বন্দ্ব কঠিন, কে জানে কে জেতে
টান পড়েছে দড়িতে এবং মানুষের ভেতরে সংঘাত চলেছে।

অনুবাদ ঃ শিশির ভট্টাচার্য

আমেরিকা

ষ্টিফেন ক্রেন

[আমেরিকান কবি Stephen Crane (জন্ম ১লা নভেম্বর ১৮৭১ মৃত্যু ৫ই জুন ১৯০০) এর I was in the darkness কবিতার ভাবানুবাদ।]

আমি যখন অন্ধকারে ছিলাম

আমি যখন অন্ধকারে ছিলাম
এমন অন্ধকার
যে আমার শরীর আমি দেখতে পাই না
শুনতে পাই না চেনা শব্দগুলোকে
মনের গভীর ইচ্ছাগুলোও লুকিয়ে থাকে
গহন অন্ধকারে ঃ
হঠাৎ কখন চারদিকে আলো জ্বলে উঠল
আর আমি আমার দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে
চীৎকার করে উঠলাম—
"হে ঈশ্বর, আমায় আবার
সেই অন্ধকারে ফিরিয়ে নাও।"

অনুবাদ ঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে :

সিন্ধী কবিতা

শেখ অয়াজ

[শেখ অয়াজ সিন্ধুদেশের ভাষা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কবি। ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ইনি জঙ্গী চক্রান্তে কারাবন্দী ছিলেন।]

ঈদের দিন

ঈদের দিন—
কিন্তু আমার কবরের নিচে জ্বলছে
সর্বনাশের বরবাদী আগুন
কেননা
আমার পুত্রের পৌত্র
আমার কবর বেদিতে
ফুলের গুচ্ছ রেখে
ঈশ্বরের করুণা চাইছে
উর্দু ভাষায়।

অনুবাদ—শ্যামল মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিকালের আধুনিকতাবাদী কবিকুল আধুনিকতার যে সক্রিয় সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার থেকে আধুনিকতার রূপ বলতে আমরা বুঝি, প্রাচীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার। প্রাচীনতার মধ্যে গতানুগতিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যানুসরণ মিশিয়ে থাকে। নতুন পথে চলার তাগিদে যারা সেদিন কাব্যের চিরন্তন ঐতিহ্যের পথ ত্যাগ করেছিল, তাদের কাউকেই আজ খুঁজে পাই না। হঠাৎ চমক দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে শাশ্বত সংস্কৃতির আলো নেই। কাব্যের ছন্দ ত্যাগ করলাম, ভুলে গেলাম মিল, যতি ইত্যাদি। নিরাবরণ কাব্যলক্ষ্মীর অঙ্গের সৌন্দর্য নিয়েও টানাটানি সুরু হল। প্রচলিত শব্দ ব্যবহার আর নয়, নয় ব্যবহৃত উপমা, অনুপ্রাসের প্রয়োগ। এমনকি ভাবনার মধ্যেও থাকবে না রোমান্টিকতার বোধ।

কিন্তু জল ছাড়া তৃষ্ণা মেটে না। চিনি দুধ না দিয়ে শুধু কফির পাতা ভিজোনো লিকারেও স্বাদ পায় না সাধারণ মানুষ। তাই আধুনিক হওয়ার প্রয়াস কারুকে মুগ্ধ করতে পারেনি। সময়মত প্রাজ্ঞ কবিবৃন্দ পথ পরিবর্তনের সূচনা ঘোষণা করলেন।

তাই এখন কিছু কবিতা দেখতে পাই, যার মধ্যে আস্বাদন করার মত রস আছে। কবে কোন্ এক প্রবীণ পণ্ডিত বলেছিলেন যে, 'রসাত্মক কাব্যই কাব্য', তাঁর কথা আজও সগর্বে জেগে আছে। এখন কেউ কেউ উপলব্ধি করছেন যে, চেষ্টা করে রসসৃষ্টি হয় না, প্রকরণ ও প্রয়োগ কুশলতার মধ্যে সহজাত রসবোধ থাকা দরকার। যার দ্বারা বিদগ্ধ পাঠক পাণ্ডিত্যে দগ্ধ না হয়ে রসে মুগ্ধ হবেন।

সমকালীন বাংলা কবিতার কথা বলতে বসেছি, কারণ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দু' একটি কবিতার বই হাতে এসেছে। প্রফুল্লকুমার দত্তর 'স্বনির্বাচিত কবিতা' এমনই একটি বই। প্রথমে মনে হয়েছিল ইনি 'আধুনিক কবিতা'র জগতে বিচরণকারী তথাবর্ণিত উন্নাসিক কবিকুলের একজন। কিন্তু কবিতাগুলি পড়বার পরে মনে হ'ল আধুনিকতার লোভে কাব্যলক্ষ্মীর মধুবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর হয়নি। তাই প্রফুল্লকুমার দত্ত সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। সমসাময়িককালের নৈরাশ্য, বিভ্রান্তি ও বেদনা তাঁকে বিপর্যস্ত করলেও জীবনের গভীরতর বোধ থেকে তিনি সরে যাননি। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি

পংক্তির উল্লেখ করতে পারি—

"সমস্ত জীবনভোর কবিতা, প্রেয়সী আর অফিস—ত্রিকোণ
তিনদিকে টেনেছে ; আমি কোনোদিকে ধরা দিতে পারিনি বলেই
কারো সুপ্রসন্ন মুখ দেখিনি—দেখবো না।"

শ্রীমতী রেখা দত্তর কবিতায় যুগের অপরিসীম বেদনানুভবের সঙ্গে মিশেছে জীবনের নিবিড় ভালোবাসা। তাঁর 'দুরন্ত আগুন' শুধু দাহ নয়, আলোও দিয়ে যায়। তাই তাঁর কবিতায়,

"আমার যন্ত্রণা কবে তোমার যন্ত্রণা হয়ে গেছে
ক্রুশবিদ্ধ যিশু,
বলো, একেই কি বলে ভালোবাসা।"

শ্রীমতী দত্তের কবিমনে এক পরিপূর্ণ আশার উজ্জ্বলতা তাঁর সমস্ত দুঃখানুভবকে ছাপিয়ে উঠেছে।

"মনের গোপন দ্বার খুলে গিয়ে আলোর জোয়ার"…

অথবা

"……এই অন্ধকার ঘরে পৃথিবীর আলো
দেখতে চাই।"

উল্লিখিত কবিদ্বয়কে আধুনিকতার পংক্তিতে তুলে ধরতে একটুও দ্বিধা নেই। যদিও প্রচলিত অর্থে তাঁরা আধুনিক নন। কাব্যসংজ্ঞায় রসবিচারে আজ যা আধুনিক, আগামীকালে তার মূল্য সেই প্রাচীনতার বল্মীকস্তূপে ঢাকা পড়তে পারে। কাব্যের মূল্য নির্ধারণে আধুনিকতা কষ্টিপাথর নয়। কাব্যের মূল্য হৃদয়ের গভীরে, যেখানে শুধু অনুভবের সমুদ্র নীলিমা। শব্দের নুড়ি পাথর শুধু বেলাভূমিতেই ছড়ানো থাকে। সমুদ্রের গভীরে কেবল অতল বেদনার অনুভব। কাব্য রসাস্বাদন তার পক্ষেই সম্ভব যার হৃদয়ে সেই অনুভবের নিবিড়তা আছে। এবং তিনিই সার্থক কবি যিনি মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে ভাবের অনুরণন তুলতে পারেন। যিনি জীবনকে বীণার মত বাজাতে পারেন।

—সন্তোষকুমার অধিকারী

স্বনির্বাচিত কবিতা—প্রফুল্লকুমার দত্ত। পূর্বাশা প্রকাশন। কলকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।
দুরন্ত আগুন। রেখা দত্ত। পূর্বাশা প্রকাশন। কলকাতা-৯। দাম—চার টাকা।